BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

হুমায়ুন আজাদ

মাতাল তরণী

www.BDeBooks.Com

দ্বিতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

আগামী প্রথম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

স্বত্ব হুমায়ুন আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 04 1390 4

Matal Taroni : by Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh.
Phone : 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

Second Printing February 2011

First Published : February 1992
First Agamee Printing : February 2009

Price : Tk. 150.00 Only

উৎসর্গ
রীনা
সাজ্জাদ কবির

www.BDeBooks.Com

মুখবন্ধ

১৯৮৭তে কয়েকজন বিদ্রোহপ্রবণ তরুণ বের করেছিলেন *দেশবন্ধু* নামে একটি সাপ্তাহিক; আমাকে বাধ্য করেছিলেন এক ধরনের প্রবন্ধ লিখতে, যার জনপ্রিয় নাম 'কলাম'। আমি লিখেছিলাম 'মাতাল তরণী' নামে। আমরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন বক্তব্য পেশ ক'রে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সাপ্তাহিকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত করাতে সফল হয়েছিলাম। অদম্য ওই তরুণেরা তাতে দ'মে যান নি, একটি নিষিদ্ধ পত্রিকার গৌরব বুকে নিয়ে তাঁরা বের করেন একই স্বভাবের আরেকটি সাপ্তাহিক : *পূর্বাভাস*। তাতেও আমাকে লিখতে হয় কলাম। এ-বইতে সংকলিত হলো *দেশবন্ধু* ও *পূর্বাভাস*-এ প্রকাশিত কলামসমূহের একগুচ্ছ। আমি আসলে লিখেছি ছোটো আকারের প্রবন্ধ, বা বলা যেতে পারে, খাঁটি প্রবন্ধ। পশ্চিমে প্রবন্ধ আঙ্গিকটি দেখা দিয়েছিলো লেখকের চিন্তা ও বক্তব্য সংহতরূপে প্রকাশের জন্যে; প্রথম দিকে তা ছোটোই হতো, এবং তাতে তথ্যের থেকে বক্তব্যই হতো মূল্যবান। আমি এ-লেখাগুলোতে তাই করতে চেয়েছি। আমার প্রবণতা সব ধরনের স্বৈরাচার ও প্রথা ধ্বংস করা; এ-প্রবন্ধগুলোতে তা অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

১/৪ ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
হুমায়ুন আজাদ
২৭ পৌষ ১৩৯৮ : ১১ জানুয়ারি ১৯৯২

সূচিপত্র

পতিতারাই প্রসিদ্ধ এখন ১১ নারী ও মৌলবাদী–মার্ক্সবাদী রক্ষণশীলতা ১৪ বাঙলাস্তান ১৭ পাকিস্তান-ব্যাধি ২০ একনায়কগণ ২৩ গোলামেরা ২৬ সৎ মানুষদের জন্যে শোকগাথা ২৯ সুখে থাকুন শহীদেরা ৩২ শ্রেষ্ঠ সময় ৩৫ সিংহ ও গর্দভগণ ৩৮ কতো রক্ত বৃথা গেলো হিশেব রাখি নি ৪১ আলবদরেরা ৪৪ স্বৈরপর্বে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা ৪৭ ধনীরা সবাই কারাদণ্ডের উপযুক্ত ৫০ ইসলামি বিশ্ব : অন্ধকার এলাকা ৫৩ মরুভূমিতে বাঙালির লাশ ৫৬ ব্যঙ্গচিত্রের স্বাধীনতা ৫৯ মুসলমান কে ও কী? ৬২ তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড ৬৫ ক্যাঙ্গারু নয় বাদুড় বুদ্ধিজীবী ৬৮ নির্বাচন, ছাত্ররা ও ছাত্রনেতারা ৭১ কোটি টাকার নির্বাচন ৭৪ দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ ৭৭ একটি একাডেমির পতন ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ৮০ মধ্যপ্রাচ্যেই হবে পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা? ৮৩ নীতিহীন সরকার ও তার অসুস্থ স্বাস্থ্যনীতি ৮৬ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : এক গুলাগ দ্বীপ? ৮৯ চর্মরোগগ্রস্ত মন্ত্রীসভা ও আধ্যাত্মিক পাউডার ৯২ নারীরাই কি স্বৈরাচারের শেষ প্রধান প্রতিপক্ষ? ৯৫ নেকড়েদের বিদায় : গণঅভ্যুত্থানেই মুক্তি ৯৮ বাঙলাদেশ একটি জাতীয় সরকার চায় ১০১ গণতন্ত্রের তীর্থে কারা যান ১০৪ মিছিলের মানুষ ১০৭ জামাতের সাথে বসবাস : গণতন্ত্রের বদলে ফ্যাশিবাদ ১১২ বাঙলাদেশি গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ দান : গরিব গ্রহের সবচেয়ে রূপসী প্রধান মন্ত্রী ১১৫

www.BDeBooks.Com

পতিতারাই প্রসিদ্ধ এখন

প্রতিটি মানুষ এখন যেমন পিঁপড়ের মতো ছুটছে পুঁজির পেছনে, তেমনি প্রতি মুহূর্তে ছুটে চলছে প্রসিদ্ধির পাছে পাছে। আজকের বাঙলাদেশের প্রতিটি মানুষই বিশিষ্ট আর বিখ্যাত; পাড়ায় পাড়ায় এখন বাস করেন প্রসিদ্ধরা, গলিতে গলিতে থাকেন অমরেরা। আমার গলিতেই থাকেন জন দশেক বিখ্যাত ব্যক্তি, যাঁদের মহাপ্রয়াণের পর আমরা সভা করে তাঁদের আদর্শ অনুসরণের জন্যে জাতিকে ডাক দেবো। আছেন ৩টি গুণ্ডা বা সম্ভাব্য মন্ত্রী, ২টি অ্যাকস্ট্রা, ৪টা টিভিনায়ক, ২টি দালাল, ১টি ছড়াকার, ২টি সিনেমা সাংবাদিক, ২টি অভিনেত্রী। এতোগুলো বিখ্যাত ব্যক্তি নিয়ে গলিটা সব সময় থরথর ক'রে কাঁপে, জ্বরের ঘোরে কোঁকায়, আর রাতদুপুরে শস্তা মাতালের মতো প্রলাপ বকে। গলির যাঁরা এখনো বিশিষ্ট আর বিখ্যাত আর আধা-অমর হ'তে পারেন নি, তাঁরাও প্রাণপণে খ্যাতির পেছনে লেগে আছেন;– হাত সাফাইয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ১ ডজন, ২টি অষ্টাদশী ধেইধেই ক'রে ছাদে লাফানো শুরু করেছেন, ছোটোখাটো ধর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন ১জন, আর ২টি পেয়েছেন নিরীক্ষামূলক নাটকে খলনায়কের পার্ট। কিছু দিনের মধ্যেই দেখবো আমার গলিতে আর অখ্যাত কেউ নেই। যাদুঘর যেভাবে বেড়ে উঠছে, মলমূত্র দেখলেই ঐতিহাসিক দলিল ভেবে পিছলে পড়ছে, তাতে বিশ্বাস করি গলিটা একদিন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সরণীতে পরিণত হবে।

এখন আমি আর বাজে বই প'ড়ে সময় কাটাই না; আমার ছাত্রীদের সচিত্র সাক্ষাৎকার প'ড়ে চমৎকারভাবে অবসর যাপন করি। পাড়ার যে-মেয়েটিকে মাংসের স্তূপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে গেলে কল্পনাপ্রতিভার দরকার পড়ে, একদিন দেখি একটি পত্রিকা তার সচিত্র সাক্ষাৎকার ছেপেছে। বড়ো উল্লসিত হয়ে উঠি। সত্যিই ওর সাক্ষাৎকার না নিয়ে পত্রিকাগুলো এতোদিন কী ক'রে ছিলো? সাংবাদিকেরা কি এতোদিন অন্ধ ছিলো? এরপর দেখেছি পাড়ার অধিকাংশ মেয়ে, আর আমার অধিকাংশ ছাত্রীই বিখ্যাত;– আমার ছাত্রগুলোর একবারেই প্রতিভা নেই, ওদের যে মাংসের প্রতিভা নেই। দৈনিক-সাপ্তাহিকগুলো খুললে এখন মনের মতো পাঠ্য বিষয় পেয়ে যাই; কোনো যুবতীর কাছে শিখি আমার রাজনীতিক দৃষ্টি কী হওয়া উচিত, কারো থেকে শিখি প্রকৃত উপন্যাস কী, আবার কারো ওষ্ঠ থেকে শুনি মার্ক্সবাদের কেনো এখন দুঃসময় যাচ্ছে। আমার খুব ভালো লাগে। যে মেয়েটি দশটি বানানের মধ্যে পাঁচটিই ভুল লেখে, সে যে এতো জ্ঞানের খনি, এটা জেনে সুখের সীমা থাকে না।

নিউমার্কেটের মোড়ে যেখানে রাস্তায় পত্রপত্রিকা বিছানো থাকে, সেখানে মাঝে মাঝে আমি যাই। এক প্রচ্ছদে কোনো তরুণীর গোপন কথা, আরেক প্রচ্ছদে কোনো

নায়িকার নগ্নকথা; এক প্রচ্ছদে রঙিন হয়ে আছে কোনো আকর্ষণীয় ধর্ষিতা, আরেক প্রচ্ছদে ঝলমল করছে কোনো সম্ভাব্য পতিতা। আমি বুঝি এরা খুবই প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত; – সারা জাতি তাদের জীবন ও শরীরের রোমাঞ্চকর বাঁকগুলোর জন্যে পাগল হয়ে আছে। জায়গাটি একটি মুদ্রিত পতিতালয়। বাঁচাল প্রিন্টিংপ্রেস তার বিষাক্ত পেট থেকে উগড়ে দিচ্ছে এসব আবর্জনা। প্রসিদ্ধ হ'তে হ'লে এখন বাঁকশোভিত হ'তে হয়, বাঁকগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হয়, ক্যামেরার সামনে উপচে দিতে হয়; প্রসিদ্ধ হ'তে হ'লে ন্যাংটো হ'তে হয়। এখন দিকেদিকে তলী আর পট্টিগুলো উঠে যাচ্ছে ব'লে তার স্থান নিচ্ছে পত্রিকাগুলো? কয়েক দশকে বাঙালি মুসলমানের খুব উন্নতি হয়েছে। এক সময় অভিনেত্রী হওয়া ছিলো কলঙ্ক, এখন গৌরব। কোন মেয়েটি এখন অভিনেত্রী, কোন ছেলেটি এখন অভিনেতা হতে চায় না? চাইবে বা কেনো? যে সমাজ যতো চিত্রতারকা সৃষ্টি করতে পারে, সে সমাজই ততো উন্নত! শুনেছি এক সময় সিনেমায় নাটকে মেয়েরা আসতো পতিতালয় থেকে, দাসী বিনোদিনী এসেছিলো সেখান থেকেই। সেটা বড়ো দুর্দিন ছিলো। এখন অভিনেত্রীরা আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখন লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের আমরা ওখানে পাঠিয়ে বলি, যাও মেয়ে...হও। চমৎকার উন্নতি ঘটেছে আমাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাও এখন অ্যাকস্ট্রা হওয়ার জন্যে পাগল; অধ্যাপক পাগল টেলিভিশনের বিদূষক হওয়ার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন কার স্থান দখল করছে?

অভিনেত্রী হ'তে পারলে কথা নেই, একরাতেই বিখ্যাত, এমনকি অমর। মনীষী সিনেমা সাংবাদিক তাকে উন্মোচিত ক'রে দেবেন বিশ কোটি চোখের সামনে। পাগল হয়ে উঠবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র কি মাথা ঘামায় বিজ্ঞানীর জন্যে, প্রকৌশলীর জন্যে, গবেষক মেয়েটির জন্যে, কবির জন্যে, ওরা আবার কে? রাষ্ট্র চায় নায়কনায়িকা। একটি মহান পত্রিকায় সেদিন দুই নায়িকার চুলোচুলি পড়ছিলাম। খুব ভালো লাগছিলো; এতোদিন আমি মোটামোটা বই প'ড়ে অযথাই সময় খুইয়েছি। এক প্রসিদ্ধা বলছেন, জনগণ তাঁর জন্যে পাগল হয়ে যাবে যদি তিনি বক্ষোবাস একটু খোলেন; আরেক প্রসিদ্ধা বলছেন, তিনি বিদ্যুৎ, তাঁর বক্ষোবাস উন্মোচনের দরকার নেই, তিনি হাঁটুর কাপড় একটু উঠোলেই সারা রাষ্ট্র তাঁর জংঘায় উপুড় হয়ে পড়বে। একি শুনছি, প্রাতঃ ও রাতস্মরণীয়াদের মুখে? এ যে বাদামতলীয় কোন্দল, অন্ধকার গলিতে খদ্দের টানাটানির সঙ্গীত। বারবার মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে এখন প্রসিদ্ধ এবং প্রচ্ছদে কারা?

পণ্যনারীদের পরেই যাঁরা প্রসিদ্ধ বাঙলাদেশে, তাঁরা সম্ভবত সাংবাদিক। সাংবাদিক হ'লে সভাসমিতিতে খুব ডাক পড়ে, সপ্তাহে দু-তিনবার প্রধান বা বিশেষ অতিথি হওয়া যায়। আয়োজনকারীরা জানে, সম্পাদক বা কোনো সাংবাদিককে প্রধান অতিথি করলে সংবাদটা ফলাও ক'রে ছাপা হবে কাগজে। ভাগ্য ভালো হলে প্রধান অতিথির পাশে বসা সংঘের সভাপতির একটি ছবিও ছাপা হয়ে যেতে পারে। একজন সাংবাদিককে আমি জানি, যিনি প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন ক'রে এসে নিজেই খবরটা লেখেন, এবং নিজের নামের আগে 'বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক' বিশেষণগুচ্ছ বসিয়ে থাকেন। এক সম্পাদক তো সপ্তাহে চার পাঁচ দিন আলুর বাজারে, বা সাঙ্গুপট্টিতে, বা

www.BDeBooks.Com

ইটখোলায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণদানরত নিজের ছবি ছেপে থাকেন নিজের দৈনিকে। মূর্খ জনগণ তা পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে। পৃথিবীতে একমাত্র বাঙলাদেশেই একটি অদ্ভুত সংবাদ মিলে, তা হচ্ছে এখানে সাংবাদিকেরাই সংবাদ। সাংবাদিকের নানী শাশুড়ী জান্নাতবাসিনী হ'লেও খবর ছাপা হয়; আর তিনি নিজে জান্নাতবাসী হ'লে তো প্রথম পাতায় তিন স্তম্ভ জুড়ে কবরস্থ হন। খুব চমৎকার কাজ করেন তাঁরা। নিজেদের নিজেরা প্রসিদ্ধ না করলে আর কে করবে?

ঘরে ঘরে এখন যে-বাচাল বাক্সটির জ্বালায় টেকা মুশকিল হয়ে উঠেছে, সেটি এখন থরেথরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রসব ক'রে চলছে। একবার কেউ বাক্সে ফাজলামো বা ইতরামো করতে পারলেই তিনি প্রচ্ছদ। তিনি টক না ঝাল খান, তা জেনে যাবে দেশবাসী। তাই এখন ওই বাক্সে ঢোকার প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড। আমলারা তো পদাধিকার ব'লেই প্রতিভাবান! ক্ষমতার বড়ো আর কি প্রতিভা আছে বাঙলাদেশে? পৃথিবীর কোনো দেশে, সভ্য দেশে, আমলাদের এতো দেখা যায় না ওই বাচাল বাক্সে। কিন্তু বাঙলাদেশি আমলাদের প্রতিভা প্রতি সন্ধ্যায় বিচ্ছুরিত হয় ওই বাক্স থেকে;– গোবর থেকে পরমাণু নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। এতো জ্ঞানী আর বিখ্যাত আমলা আর কোথায় পাওয়া যাবে? আছেন গরিব অধ্যাপকেরা। খুব সুবিধা নেই; নায়ক হ'তে পারেন না, বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ ডাক পড়ে না; তাই ধাঁধাঁ আর গানের আসরের খড়কুটো ধরে প্রসিদ্ধির উত্তাল সাগরে ভাসছেন তাঁরা। পশ্চিমে হ'লে এমন অধ্যাপকদের চাকুরি যেতো, কিন্তু এখানে বিখ্যাত তাঁরা।

আমেরিকায় এখন বিখ্যাত হ'তে হ'লে একটা বড়োসড়ো কেলেংকারি করতে হয়। গোপনে পাচার করতে হয় অস্ত্র, বা রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হয়ে নৈশ সমুদ্রবিহারে যেতে হয় কোনো রূপসীকে নিয়ে। বেয়াদব সাংবাদিকেরা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললে করতে হয় স্বীকারোক্তি। সহজ সরলভাবে সবার সামনে বলতে হয়, হ্যাঁ, আমি অপরাধী, আমি এ-পাপ করেছি, ও-পাপ করেছি, সে-পাপ করেছি। জাতি ভদ্রলোকের সততায় খুশি হয়ে তাঁকে লোকনায়কের শিরোপা দেয়। তবে আমরা এখনো অতোটা মার্কিনি হয়ে উঠি নি। স্বীকারোক্তি করা আমাদের স্বভাবে নেই, আমরা শুধু অস্বীকার করতে পারি। আমরা বলতে পারি শুধু মিথ্যে কথা।

কেলেংকারি ব'লেও কিছু নেই এখানে। সবাই সাধু আমরা। প্রসিদ্ধ হওয়ার ওই রাস্তা যতোদিন এখানে না খোলে, ততোদিন আমাদের পণ্যনারী, ভণ্ডপীর, পাড়ার গুণ্ডা বা সম্ভাব্য মন্ত্রী, সাংবাদিক, ধর্ষিতা, দালাল, ধাঁধাঁর আসরের উপস্থাপক, আর কালোবাজারি হয়েই বিখ্যাত হ'তে হবে।

নারী ও মৌলবাদী–মার্ক্সবাদী রক্ষণশীলতা

কোনো সমাজ নারীকে কতোখানি ভয় পায়, কতোগুলো শেকলে তার হাত-পা-আত্মা বেঁধে তাকে পীড়ন করতে চায়, সেটা জানা গেলে জানা হয়ে যায় তার সভ্যতার মাত্রা। বোঝা যায় ওই সমাজের কতোটা প'ড়ে আছে মধ্যযুগে বা তারও আগে, আর কতোটা ঢুকেছে আধুনিক যুগে। আমাকে নারীর অবস্থাটি বলুন, আমি সমাজের সভ্যতার মাত্রা বলে দেবো। যুগে যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করেছে বুনো জন্তুর থেকেও বেশি, ও তার সাথে লড়াইয়ের জন্যে উদ্ভাবন করেছে সাংঘাতিক সব অস্ত্রশস্ত্র। পবিত্র গ্রন্থগুলো পুরুষদের পারমাণবিক অস্ত্র, তাতে নিষ্ঠার সাথে তিরস্কার করা হয়েছে নারীকে : বলা হয়েছে নারী নরকের দরোজা; তার ক্ষুধা অনন্ত, যেমন অনন্ত আগুনের ক্ষুধা। প্রয়োজনে তাকে চাবুক মারার বিধানও লিবিবদ্ধ করেছে স্বর্গীয় ভাষায়। নারীর সৌন্দর্য ও ভয়ানক আবেদন পুরুষকে পতঙ্গে পরিণত ও আতংকিত করেছে; এবং পুরুষ নানা উপায় বের করেছে তাকে বন্দী ক'রে সম্ভোগের। তাকে মুক্তি দিতে চায় নি, তার বিকাশের সমস্ত পথ রোধ ক'রে রেখেছে; আর যখনি নারী বিধান মানতে রাজি হয় নি, তখনি রচনা করেছে নানা স্বর্গীয় স্তোত্র। ওই স্তোত্রের অনেক বাক্য অমানবিক নিষ্ঠুর, কিছু বাক্য তোশামোদপূর্ণ। মানুষের নিয়তি এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু পৃথিবীটা সব দেশে সমান তালে এগোয় নি। পশ্চিমের স্বভাব পেছনের দিকে চোখ না ফেলে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এবং যথাসম্ভব বড়োবড়ো পা ফেলা। প্রাচ্যের বড়ো আসুখ তার অচিকিৎস্য প্রথাবাদ; কিছুতেই সামনে এগোবে না প্রাচ্য। সামনের দিকে পা ফেলার সময়ও সজ্ঞানে ও ভুল ক'রে পেছনের দিকে পা ফেলে দেবে। নারীর ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। অনেক আগে থেকেই পশ্চিমের নারী অনেক বেশি মুক্ত আমাদের নারীদের থেকে; এবং আঠারো শতক থেকে চলছে নারীর সচেতন বিদ্রোহ। ষাটের দশকে নারীবাদীরা তাকে নিয়ে যায় চরম স্তরে। নারীবাদীরা পশ্চিমের সমাজরাষ্ট্রকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে সমাজটা দিকে দিকে বদলে যায়। গৃহে বদল ঘটে, রাস্তায় বদল ঘটে; বিশ্ববিদ্যালয়ে বদল ঘটে, কর্মস্থলে বদল ঘটে। একটা অসামান্য জিনিশকে নারীরা দখলে ফিরে পায়, সেটা নারীদের ব্যক্তিগত শরীর। ষাটের দশক থেকে পশ্চিমের নারীরা নিজেদের শরীরের এতো বিচিত্র ব্যবহার করছে যে তার কোনো তুলনা নেই। আগে পুরুষরা ভোগ করতো নারীদের শরীর, ষাটের দশক থেকে নারীরা উপভোগ করতে থাকে নিজেদের শরীর। কেইট মিলেট, বেটি ফ্রাইডান, জেরমেইন গ্রিয়ার ও আরো অনেকে নারীকে ফিরিয়ে দেয় তার শরীর, এবং দেয় এক পরিবর্তিত সমাজ।

www.BDeBooks.Com

আমাদের নারীরা এখনো মধ্যযুগে আছে, যেমন মধ্যযুগে আছে আমাদের পুরুষদের অধিকাংশ। আমরা সারাক্ষণ নারীসচেতন; অর্থাৎ নারী যে সম্ভোগযোগ্য, এটা আমাদের মনে পড়ে যায় যে-কোনো নারীর সংস্পর্শে এলেই। নারীরাও এটা ভুলতে পারে না; নিজেদের সম্ভোগযোগ্যতার কথা সব সময় মনে পড়ে তাদের। এটা এক মধ্যযুগীয় ও অস্বস্তিকর অবস্থা। মধ্যযুগ ও মৌলবাদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। মৌলবাদীদের যে পারিবারিক ও রাজনীতিক দর্শন, তার পুরোটাই মধ্যযুগীয়। তারা নারীদের রাখতে চায় ঘরে, আলোবাতাস থেকে অনেক দূরে। ধর্মে চারটি বিয়ের বিধান রয়েছে, এবং বেশ সহজ ব্যবস্থা রয়েছে বিচ্ছেদের। একজন আদর্শ মৌলবাদী চাইবে একই সময়ে তার গৃহে চারটি স্ত্রী থাকবে এবং সময় মতো সে এক-এক ক'রে স্ত্রী ত্যাগ ক'রে নতুন স্ত্রী তুলবে। এটা তার কাছে অন্যায় নয়, ধর্মসঙ্গত। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখা ও বছরে বছরে স্ত্রী ত্যাগ ও গ্রহণ চলে। অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমি ব'লে মনে হয় ওই এলাকাটিকে, সেখানে তেল ও বিদ্যুৎ যতোই থাকুক-না-কেনো। ওখানে অবস্থা এমন যে কোনো তরুণী কোনো তরুণের সাথে বিবাহিত হতে পারে না; তরুণীদের স্ত্রী হ'তে হয় কোনো ধনশালী বৃদ্ধের এবং সব সময়ই বাস করতে হয় পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ের মধ্যে। নারীর শত্রুর শেষ নেই, তবে মৌলবাদ নারীর প্রধান শত্রু।

এখানে মার্ক্সবাদীরা 'প্রগতিশীল'; কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে এক ব্যাপারে তারা যেনো মিলে যায় মৌলবাদীদের সাথে। নারীব্যাপারে প্রগতিশীলেরাও হয়ে ওঠে রক্ষণশীল। কিছুদিন আগে বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার নিয়ে একটি বিতর্ক হয়েছিলো। তাতে দেখা যায় প্রগতিশীলেরা বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহারের বিরোধী। কিন্তু এ বিরোধিতা তো প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে যায়, মৌলবাদীদেরই শক্তিশালী ক'রে তোলে। মৌলবাদীরা নারীদের নিষিদ্ধ করতে চায় বাইরে, আর প্রতিক্রিয়াশীলেরা নারীদের নিষিদ্ধ করতে চায় বিশেষ বিশেষ স্থানে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেনো নারী নিষিদ্ধ হবে? বিজ্ঞাপনে কেনো আসবে না নারী? কেনো সৃষ্টি করবে না যৌনাবেদন? যৌনাবেদনশূন্য পৃথিবীটা খুব চমৎকার বাসস্থান হবে, এমন বিশ্বাস হয় না। নারীকে যদি পুঁজিবাদীরা পণ্য হিসেবে ব্যবহার ক'রেই, তাহলে ওই পুঁজিকে বিনষ্ট ক'রে লাভ হবে না; দেখতে হবে যে-নারী পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে তার প্রাপ্য মূল্য পাচ্ছে কিনা? দেখতে হবে তার পারিশ্রমিক যথেষ্ট বেশি কিনা? সে নিজেকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার ক'রে সচ্ছল জীবনযাপন করছে কিনা? এটা না দেখে নারীকে নিষিদ্ধ ক'রে দিলে তার ক্ষতিই করা হবে বেশি। প্রগতিশীলদের লক্ষ্য তো ক্ষতিসাধন নয়।

যে-নারী কোনোভাবে আমাদের সমাজকে আঘাত বা আক্রমণ ক'রে, সে অনেক বেশি উপকারী সমাজকে-মেনে-নেয়া নারীর থাকে। মনে করা যাক একটি মেয়ে জিন্‌স্ প'রে বাইরে বেরোয়, কর্মস্থলে যায়। তখন বুঝতে হবে রক্ষণশীলতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে সে, এবং আঘাত ক'রে চলেছে সে মধ্যযুগীয় অনেককে। আমরা বিশ্বাস করবো তার চিন্তাভাবনাও হবে অগ্রসর। যে-অভিনেত্রী স্বামীর পায়ের নিচে

বেহেস্ত রয়েছে ব'লে বিশ্বাস করে বা প্রচার করে, সে ক্ষতিকর সব দিক দিয়ে। সে অনেক বাজে ছবিতে অশ্লীল অভিনয় ক'রে সমাজের ক্ষতি করেছে, কালো টাকা রুজি করেছে; আবার মধ্যযুগীয় বিশ্বাস প্রচার ক'রে সমাজ এগোতে বাধা দিচ্ছে। আর যে-অভিনেত্রীটি নিজের নগ্ন ছবি তুলতে দেয়; প্রকাশ্যে স্বীকার করে ও গৌরব বোধ করে, সে প্রগতির জন্যে অনেক উপকারী। কয়েক দশক ধ'রে দেখা যাচ্ছে আমাদের সমাজকে প্রগতিশীলতা দিয়ে আর আঘাত করা যায় না। প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রগতিশীল পরিভাষাগুলো ব্যবহার ক'রে সেগুলোর ধার কমিয়ে ফেলেছে। এখন সমাজকে চমৎকারভাবে আক্রমণ সম্ভব শুধু শরীর দিয়ে।

বেগম রোকেয়া অবরোধবাসিনীর ভূমিকায় বলেছিলেন যে তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ গুনাহগার। কারণ তিনি পুরুষের কবল থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন নারীকে। তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক মুক্তি, তবে ওই মুক্তি এখনো আসেনি। শারীরিক মুক্তি তো অনেক দূরের কথা। আমাদের নারী নিজেদের শরীরও উপভোগ করে না, কারণ পুরুষ তাদের সম্ভোগ করে। এটা সুখকর বা মঙ্গলজনক অবস্থা নয়।

মৌলবাদীরা খুবই পরিশ্রম ক'রে যাবে যাতে ওই মুক্ত অবস্থা কখনো সৃষ্টি না হয়; কিন্তু তাতে যদি প্রগতিশীলেরাও হাত মেলায়, তাহলে অন্ধকারের সীমা থাকবে না। মুক্ত হতে হবে সব রকম রক্ষণশীলতা থেকে, কিন্তু বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের প্রগতিশীলেরাও অন্তর্লোকে রক্ষণশীল। তাঁরাও একধরনের মৌলবাদী।

www.BDeBooks.Com

বাঙলাস্তান

কী নাম আমাদের মাতৃভূমির, যার জন্যে একাত্তরে আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম? বাঙলাদেশ? চারপাশের জলবায়ু শুঁকে শুঁকে আজকাল আমার মনে খুব গাঢ় ও গভীর একটি সন্দেহ জেগে উঠছে। আসলেই কি তার নাম বাঙলাদেশ? না কি অন্য কোনো নাম তাকে আরো বেশি ক'রে মানায়? দেড় দশকে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে; – শহরের সবচেয়ে রূপসী মেয়েটি রক্ষিতা হয়ে উঠেছে, মুক্তিযোদ্ধারা দীক্ষা নিয়েছে রাজাকারদের কাছে, বিপ্লব পরিণত হয়েছে নৈশ অভ্যুত্থানে; এবং অজ্ঞাতসারে বদলে গেছে আমাদের মাতৃভূমির নাম। বাঙলাদেশের নামে এখন আর তাকে মানায় না। বাঙলাদেশ নামে তাকে দিনরাত ডাকাডাকি করলেও সে সাড়া দিতে চায় না; বুঝতে পারে না যে তাকে তার নাম ধ'রে ডাকছি। কারণ খুব গোপনে তার নাম বদলে দিয়েছি আমরা। এখন তার যা স্বভাব চরিত্র, তাতে তাকে মানায় বাঙলাদেশ নয়, বাঙলাস্তান নামে। তাহলে আমাদের পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ভূখণ্ডের আসল নাম কি বাঙলাস্তান? আমার তাই মনে হয়। একটি দেশের নাম ছিলো পাকিস্তান। পাকিস্তান বলতে যা কিছু বোঝাতো – স্বৈরতন্ত্র, সামরিক শাসন, মধ্যযুগ, ষড়যন্ত্র, ধর্মান্ধতা, শোষণ; তার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণাবলি বোঝানোর জন্যে অনেক স্বপ্নেও রক্তে রচিত হয়েছিলো বাঙলাদেশ নামটি। বাঙলাদেশ বোঝাতো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইহজাগতিকতা, শোষণহীনতা, আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রগতিশীলতা। পাকিস্তান ও বাঙলাদেশ বলতে আমি বুঝতাম সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিশ; একটি আমার চোখে বোঝাতো অন্ধকার, আরেকটি নতুন সূর্যের আলো।

কিন্তু দেড় দশকে আমরা নষ্ট করেছি শুভ মূল্যবোধগুলো ; ধ্বংস করেছি বহু বড়ো বড়ো স্তম্ভ। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে এখন পারিভাষিক শব্দ; ওগুলোর চর্চা আমাদের রক্তমাংসের মধ্যে নেই। স্বাধীনতার পরপরই ভীষণভাবে ঘায়েল হয় প্রিয় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এবং এখন তাদের শিরাউপশিরায় এক বিন্দু রক্তের চিহ্ন দেখা যায় না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে রক্তাক্ত ক'রে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে যাই 'স্তান'-এর দিকে, আর সামরিক উত্থানের ফলে আমরা প্রায় গন্তব্যের কাছাকাছি উপনীত হই। অর্থাৎ আমরা বাঙলাদেশকে ত্যাগ করতে শুরু করি; এগোতে থাকি সে সব ব্যাপারের দিকে, যার সাথে পাকিস্তানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পাকিস্তান মানেই সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার। বাঙলাদেশ এ অর্থটা স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই আয়ত্ত করে ফেলে। তারপরও যে তার নাম বাঙলাদেশ রয়েছে এটা বাহ্যিক ব্যাপার; কিন্তু অন্তর্লোকে তার বিশাল বদল ঘটে গেছে। মনে হয় পাকিস্তানের হৃদপিণ্ডটা জুড়ে

দেয়া হয় বাঙলাদেশের শরীরের সাথে, এবং দিকে দিকে উত্থান ঘটতে থাকে অশুভ পাকিস্তানি শক্তিরাশির। এখন তো বাঙলাদেশে বাঙলাদেশের স্তব করাই বিপজ্জনক, অনেক বেশি নিরাপদ পাকিস্তানের বন্দনা।

বাঙলাদেশের ইতিহাসের একটি কালো ঘটনা রাজাকারদের পুনরুত্থান, যার জন্যে দেশ ও জাতিকে দিতে হবে মারাত্মক মূল্য। বাহাত্তরে কে ভাবতে পেরেছিলো দিকে দিকে আবার দেখা দেবে রাজাকাররা, আর মুক্তিযোদ্ধারা দীক্ষা নেবে তাদেরই কাছে? জিয়াউর রহমান যে-রাজাকাররাজনীতি শুরু করেছিলেন, তার কুশস্য তোলা এর মাঝেই শুরু হয়ে গেছে। একটি বেতার ঘোষণার জন্যে বাঙালি তাকে ধ'রে নিয়েছিলো একনম্বর মুক্তিযোদ্ধা ব'লে, কিন্তু ওই একনায়ক যেভাবে নিজের স্বার্থে রাজাকারদের চাপিয়ে দিয়ে গেলেন বাঙলাদেশের বুকের ওপর তাতে বোঝা যায় একবার মুক্তিযোদ্ধা মানেই চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়; এবং একনম্বর মুক্তিযোদ্ধাও একদিন শত্রু হয়ে উঠতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হওয়া খুব কঠিন : যে কোন সময় পদস্খলিত হয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠতে পারে রাজাকার। একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা দেখা দিতে পারে একাশির বা আটাত্তরের রাজাকাররূপে। তাই হয়েছে এখানে; অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা মানে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়; কিন্তু একবার রাজাকার মানে চিরকাল রাজাকার। এ রাজাকাররা বাঙলাদেশকে ক'রে তুলেছে বাঙলাস্তান। এখন জাতীয় সঙ্গীতের বিরোধিতা করতে বেশি সাহসের দরকার হয় না; পতাকাকে অপমান করার জন্যে প্রয়োজন হয় না প্রবল সাহস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে; ইউরোপে এখনো নাটশিদের খুঁজে বের ক'রে বিচার করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা নিজস্ব নাটশিদের শুধু ঘরের মধ্যেই স্থান করে দিই নি, তাদের সন্ত্রাস চালানোর ও শাসনের অধিকার দিয়েছি।

একটি ব্যাধি খুব ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে এখন, তার নাম ধর্মান্ধতা। ষাটের দশকেও এমন ধর্মান্ধতা ছিলো না; আজকের বাঙলাদেশ যতোটা ধর্মান্ধ পূর্ব পাকিস্তানও ততোটা ধর্মান্ধ ছিলো না। বাঙালি মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে সব সময়ই ধার্মিক, যদিও ধর্মের সব বিধান তাদের ভালোভাবে জানা নেই। তারা অনেক বেশি ধার্মিক মুখে ধর্মের-খই-ফোটা নেতাদের থেকে। পাকিস্তানকালে যে-মুসলিম লিগিরা ধর্মের কথা বলতো, বেশ দামি টুপি প'রে প্রতারণা করতো সাধারণ মানুষকে, এবং এখনো যারা মঞ্চে মঞ্চে ধর্মাভিনয় ক'রে চলছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন যে অধার্মিক ও অনৈতিক, এটা আমরা ভালো ক'রেই জানি। সংবাদপত্র মাঝেমাঝেই আমাদের ধর্মাভিনেতাদের কুৎসিত জীবনের সংবাদ সরবরাহ ক'রে থাকে। ভালো ক'রেই আমরা জানি বাঙলার চাষী পাঁচবার নিয়মিত নামাজ পড়তে পারে না, কিন্তু তাই ব'লে সে অধার্মিক নয়; আর এও জানি যে ধর্মাভিনেতারা যতোবারই নামাজ পড়ুক -না-কেনো, তারা খুবই অধার্মিক। ব্যক্তিগত ধর্মবোধ উপকার না করলেও অপকার করে না; কিন্তু রাজনীতিক ধর্ম ক্ষতি করে মানুষের বিশেষ করে সাধারণ মানুষের। রাজনীতিক ধর্ম ধর্মজীবীদের পুঁজি। এখন আমরা রাজনীতিক ধর্মের অসুস্থতার মধ্যে বাস করছি, আর শোনা যাচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, 'খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অসুরে।' আসুরিক খড়্গ

www.BDeBooks.Com

[illegible] শব্দে এখন আতঙ্কিত বাঙলাদেশ ও তার প্রগতিশীল পুত্ররা। সে সব [illegible] সংক্ষিপ্ত নাম ছিলো বাঙলাদেশ, তার সবই দেড় দশকে মৃত বা মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। গণতন্ত্র চেয়েছিলাম, কিন্তু গণতন্ত্র কাকে বলে, তা জানতেও পারলাম না। সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন বেশ গাঢ় লাল রঙে দেখেছিলাম, কিন্তু তা ভোরের স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। চেয়েছিলাম দেশ শাসিত হবে এমন প্রক্রিয়ায়, যা কল্যাণ আনবে মানুষের। কিন্তু বারবার পাওয়া গেলো সামরিক শাসন। বুটের মতো দেশকে বারবার নিজেদের পায়ে পরে নিলো সশস্ত্রবাহিনীর ক্ষমতালোভীরা। একবার সামরিক শাসনের অর্থ হচ্ছে এক শতাব্দী পিছিয়ে যাওয়া; আর আমরা ক-শতাব্দী পিছিয়েছি, এবং আরো পিছোবো, তা হিশেব করে দেখার মতো। চেয়েছিলাম ইহজাগিতকতা, তার বদলে দিকে দিকে প্রাদুর্ভূত হলো সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা। আর কী পাওয়ার বাকি আছে দেড় দশকে? তাই দেশের নাম আর কী ক'রে থাকে বাঙলাদেশ? তাকে আর কী ক'রে ডাকে বাঙলাদেশ নামে? আর সেও কি ভুলে যায় নি তার আসল নাম? তাই বাঙলাদেশ নামে দিনরাত ডাকলেও সাড়া দেবে না এ-ভূখণ্ড। সাড়া দেবে বাঙলাস্তান নামে। পাকিস্তানের জন্যে যাদের আত্মার কান্না থামে নি, কোনোদিন থামবে না, তারা দেশটিকে আর পাকিস্তান বানাতে পারবে না; কিন্তু তারা খুবই সুখ পাচ্ছে যে তারা একটি বাঙলাস্তান প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাঙলাদেশ, মাতৃভূমি, তুমি আর বাঙলাদেশ নও, তুমি এখন স্বাধীনতার শত্রুদের বাঙলাস্তান।

পাকিস্তান-ব্যাধি

চল্লিশের দশকের শুরু থেকে বাঙালি মুসলমানকে একটি দুরারোগ্য রোগে ধরেছিলো। রোগটির নাম পাকিস্তান-ব্যাধি। সাধারণদের ওই রোগটি কতোটা কাবু করেছিলো, তার লিপিবদ্ধ বিবরণ বেশি পাওয়া যায় না, কিন্তু অসাধারণেরা আক্রান্ত হয়েছিলো অসাধারণভাবেই। শাহিনা খাতুন নামের একজন ভুলে-যাওয়া নাট্যকারের আজাদী (১৩৫৯) নাটকের একটি চরিত্র ভালোভাবে বুঝেছিলো পাকিস্তান কী জিনিশ। চরিত্রটি, যেনো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গেছে, চিৎকার উঠেছিলো এভাবে : 'হুনবার লইছি পাহিস্থান নাকি অইল। গরীবগো মারবার লাইগ্যা। হক্কলে কয় পাহিস্তান অইল, নাকি গরীবগো লাইগ্যা গোরস্থান অইল।' পাকিস্তানকে গরিবেরা বুঝেছিলো অস্থিমজ্জায় কিন্তু অসাধারণেরা, যারা কবিতাটবিতা ও গল্পপ্রবন্ধ লিখতো, তারা পাকিস্তানের পাটুকুও বুঝতে পারে নি। পারে নি কারন তাদের অস্থিমজ্জায় ঘা লাগে নি। না পেরে বেশ বড়োসড়ো একটি চমৎকার স্বর্গ বানিয়ে তারা বাস করতে শুরু করে; এবং থেকে থেকে আরবি- ফারসি-উর্দু মেশানো বাঙলায় বন্দনা করে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের পিতার। কেউ স্বপ্ন দেখতে থাকে পাকিস্তানে খোলাফায়ে রাশেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আবার কেউ দেখে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মধ্যযুগীয় মুসলমানের রাজকীয় ঐশ্বর্য। পদ্যেপদ্যে তারা কোলাহল কলরোল শুরু করে দেয় পাকিস্তান বন্দনার, আর মিশ্র বাঙলায় রচিত হয়ে যায় একরাশ পাকিস্তানি পদ্য। ভাষা কি সে সব পদ্যের! আরবি ফারসি উর্দুতে বোঝাই হয়ে ওঠে বাঙলা পদ্যের পংক্তি; স্তবকে স্তবকে দেখা দিতে থাকে হেরার গুহা, তায়েফের পথ, জেরুজালেমের মাঠ, আর জোব্বা, আমামার সজ্জা ও আরো অনেক স্বপ্ন। এসব পদ্য ব্যবচ্ছেদ করলে ধরা পড়ে একটা ব্যাধি, যার নাম পাকিস্তান-ব্যাধি। ওই ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মধ্যযুগীয়তা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, ধর্মান্ধতা, শোষণপরায়ণতা প্রভৃতি। ব্যাধিটা এতো মারাত্মক ছিলো যে ওই পদ্যকার ও প্রবন্ধকারদের বুক থেকে কবিতা ও চিন্তা পুরোপুরি বিদায় নেয়; জ'মে ওঠে শুধু প্রগতিবিমুখতা।

বাঙলা ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার জন্যে কেনো দরকার পড়ে আরবি ফারসি উর্দুর? দরকার পড়ে, যদি ব্যাধি বুকে বাসা বাঁধে। যদি পাকিস্তান ব্যাধিটি খুব চাড়া দিয়ে ওঠে, মন ম'জে যায় প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যযুগীয়তায় তাহলে ওই সব শব্দের বেশ দরকার পড়ে। তখন বাঙলা কবিতার পংক্তি হয়ে ওঠে 'তোমার শারাব পানে মনে ধরে বেহুশ বেতাবী', বা 'ওগো রুখপাখী, জরীন দিনের বয়জাতে তাও দানি', বা 'পাতলা মেঘের নেকাব খুলিয়া দাও', বা 'জারির জোব্বা, শেরোয়ানী, আর আমামার

www.BDeBooks.Com

গজায়/আতরের পানি, মেশকের রেণু খোসবু বিলায়ে যায়'; আর কবিতার নাম হয় 'আসনে আজাদী', 'দিলরুবা', 'কওমী তামান্না' ধরনের মাতালের প্রলাপ। এমন কবিরা প্রগতির, চেতনার, শিল্পের কথা বলেন না, মানুষের মুক্তির কথা বলেন না; তারা পথ তৈরি করেন শোষণের, পীড়নের, প্রতিক্রিয়াশীলতার। এ কবিদের বড়ো শত্রু ছিলো সাম্যবাদ, কারণ পাকিস্তান ছিলো সাম্যবাদের শত্রু। তবে তারা কি সব সময় বিশ্বাস থেকে স্তব করতো পাকিস্তানের? গভীর বিশ্বাসে তাদের পদ্যেপদ্যে ঢুকিয়ে দিতো আরবি-ফারসি-উর্দু? তা মনে হয় না। নানা রকম সুযোগসুবিধার দিকে চোখ পড়ে ছিলো তাদের। আরবি-ফারসি-উর্দুর কারুকাজ দিয়ে তারা মন ভোলাতে চেয়েছিলো পাকিস্তানি প্রভুদের, যাতে সুযোগসুবিধার দু-একটি উচ্ছিষ্ট কণা বর্ষিত হয় তাদের মাথার ওপর। যিনি নিজের পদ্যে নোংরাভাবে অঢেল ব্যবহার করেছেন আরবি-ফারসি-উর্দু এবং একসময় অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠেন প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজাকারদের জাতীয় কবি, সে-ফররুখ আহমদ ১৯৪৪ সালে বিদ্রূপ করেছিলেন উর্দুপ্রেমিকদের এভাবে : 'দু'ইশো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন/বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা।' এর পাঁচ বছর পর বাঙলা কবিতায় আরবি ফারসি-উর্দুর কারুকাজ করা কবিদের বিদ্রূপ করেছিলেন আজহারুল ইসলাম। তিনি লিখেছিলেন, 'মরুর দেশের ঢঙে শুরু করে কেহবা বাংলা লিখা,/মওকা বুঝিয়া কেহ কেহ করে উর্দুরে আজি নিকা,– অর্থচিন্তা সবারি মাঝে খেলিতেছে মাস মাস সাধে কি সকল লেখক করিছে বোগদাদী ভাষা চাষ।' তাই 'বোগদাদী ভাষা চাষ' –এর পেছনে দেখতে পাই দুটি রোগ : একটি পাকিস্তান-ব্যাধি, আরেকটি সুযোগসুবিধা-ব্যাধি। পাকিস্তান-ব্যাধির প্রথম ভালো চিকিৎসারূপে দেখা দেয় বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন। এ-সময়েই অনেকে বুঝতে পারে শুধু ইসলাম, মুসলমান, পাকিস্তান ইত্যাদি শব্দ নিয়ে বেশি দিন আর সকলকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ফলে পাকিস্তানি শায়েরদের উৎসাহ কমতে থাকে; অনেকে কবিতা থেকে প্রায় বিদায় নেয়। তরুণ লেখকসম্প্রদায় তখন আসতে শুরু করেছেন, যাঁদের কাছে পাকিস্তানকে আর ততোটা পবিত্র মনে হয় নি। বায়ান্নো থেকে বাঙলা ভাষাও মুক্তি লাভ করতে থাকে পাকিস্তান-ব্যাধির কবল থেকে; তবে পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। পাকিস্তান-ব্যাধির চরম চিকিৎসারূপে দেখা দেয় মুক্তিযুদ্ধ; তলিয়ে যায় পাকিস্তান, আর তার সাথে তলিয়ে যায় ব্যাধিটাও। তবে আসলেই কি ব্যাধিটা নির্মূল হয়েছিলো? না কি কয়েক বছর একটু নিস্তেজ হয়ে ছিলো, চাড়া দিয়ে ওঠার সাহস পায় নি। এখন চারদিকে যা ঘটছে, তা দেখে বোঝা যায় স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছর পাকিস্তান-ব্যাধিটা লুকিয়ে ছিলো আক্রান্তদের হৃদপিণ্ডের ভেতরে। সুযোগ পেয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার চারদিকে দেখতে পাচ্ছি দুরারোগ্য পাকিস্তান– ব্যাধি।

হানাদারবাহিনী কারা? এখন আর সরকারিভাবে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় না কথাটি। মনে হয় অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছিলো হানাদারবাহিনী; এবং তারা আমাদের দেশে চালিয়েছিলো হত্যাযজ্ঞ। শিশুদের বইগুলোতে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর নাম করা হয় না। বরং এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে যাতে শিশুরা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে হানাদার হিশেবে শনাক্ত করে। জাপানে মার্কিনপ্রভাব এতো প্রবল হয়েছে যে

অধিকাংশ তরুণতরুণী জানে না তাদের দুটি শহরের ওপর আণবিক বোমা ফেলেছিলো আমেরিকা। এমন একটা জলবায়ু সেখানে তৈরি করা হয়েছে, তাতে অনেক তরুণতরুণী মনে করে যে রাশিয়াই বোমা ফেলেছিলো তাদের শহরের ওপর। এমন অবস্থা এখন তৈরি হচ্ছে বাঙলাদেশে। পাকিস্তানকে এখন জনপ্রিয় করার এমন সব কলাকৌশল চলছে যে একদিন হয়তো তরুণতরুণীরা ভাববে ভারতই ছিলো হানাদারবাহিনী। চারদিকে এখন চলছে পাকিস্তান-ব্যাধির ব্যাপক সংক্রমণ; তাতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু-কিশোর-তরুণেরা।

যে-পাকিস্তানকে ঘৃণার চোখ দেখা উচিত, তাকে এখন দেখা হচ্ছে অনুরাগের দৃষ্টিতে। শহরের পথে এমন কিছু তরুণতরুণীকে দেখা যায়, যাদের পোশাক দেখে মনে হয় তারা পাকিস্তানের কাছে বিকিয়ে গেছে। ক্রিকেট ও আরো কোনোকোনা খেলা এখন পাকিস্তান-ব্যাধি প্রসারে খুবই সাহায্য করছে। দেখা যায় বহু ক্রীড়ানুরাগী পাকিস্তানি দলের প্রচণ্ড সমর্থক। এটা শুধু বিশুদ্ধ ক্রীড়ানুরাগ নয়। এর মাঝে রাজনীতি ও পাকিস্তান-ব্যাধিটা রয়ে গেছে। পাকিস্তানকে সমর্থন করার একটা পরোক্ষ পদ্ধতি হচ্ছে পাকিস্তানি দলকে সমর্থন করা। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র এতে উৎসাহ যোগাচ্ছে, এবং সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়ছে পাকিস্তান-ব্যাধিতে। ব্যাধি আপনাআপনি হয় না। ব্যাধি হওয়ার জন্যে ব্যাধির জীবাণু দরকার। রাষ্ট্রযন্ত্রও কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক দল যেভাবে ব্যাধির জীবাণু ছড়িয়ে চলছে, তাতে আরো বহু মানুষের অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট। প্রগতিশীলদের এখনি অনেকটা কেটে গেছে; কিন্তু বিনোদন ও রাজনীতিতে তা প্রবেশ করেছে। একে রোধ করা দরকার; নইলে সামনে অপেক্ষা ক'রে আছে অন্ধকার দুঃসময়।

www.BDeBooks.Com

একনায়কগণ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অসুস্থ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন 'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ/নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা।' দু-দুটি মহাযুদ্ধ আর একাধিক বিপ্লব দেখে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। তিনি দেখেছিলেন, 'কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে', আর শুনেছিলেন, 'মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে।' তাই একা হিটলারের নিন্দা করতে তাঁর বিবেকে বেঁধেছিলো। পৃথিবী খুব বেশি হিটলার আর স্ট্যালিন জন্ম দেয়ার মতো জরায়ু ধারণ করে না, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার গর্ভ অজস্র পুঁচকেছিঁচকে একনায়ক প্রসব করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরাধীন পৃথিবীর দিকে দিকে দেখা দিতে থাকে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র এবং অবিলম্বে স্বাধীনতাকে ধর্ষণ ক'রে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে উত্থান ঘটতে থাকে সামরিক একনায়কদের। এশিয়া, আফ্রিকা ও অভ্যুত্থানের মাতৃভূমি লাতিন আমেরিকায় একের পর এক দেখা দিতে থাকে তারকাখচিত একনায়কেরা। বাতিল হয়ে যায় স্বাধীনতা, মানুষ পরিণত হয় মেষে, চলতে থাকে একনায়ক ও সাঙ্গোপাঙ্গবর্গের অবাধ দুর্নীতি ও দুঃশাসন। কেউ দেখা দেয় লৌহমানব, কেউ জাতির ত্রাতারূপে। তারা নিজেদের শরীরকে ভূষিত করতে থাকে নতুন নতুন উপাধি ও তারকায়, এবং প্রচারমাধ্যমগুলোকে পরিচারক বানিয়ে তৈরি করতে থাকে নিজেদের মহান মহান ভাবমূর্তি। জনগণ ওই মূর্তির নিচে পিষে যেতে থাকে বছরের পর বছর। গণতন্ত্রে বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস না থাকলেও তাদের অনেকে মুখর হয় গণতন্ত্রের গুণগানে। জনগণকে এক অপূর্ব গণতন্ত্র উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে তারা, এবং একসময় উপহার দেয় প্রতিশ্রুত একনায়কী গণতন্ত্র। উর্দি খুলে ফেলে সুন্দর পোশাক প'রে জনগণের পক্ষ থেকে তারা নিজেদের হাত থেকে নিজেরাই গ্রহণ করে ওই অসামান্য গণতন্ত্র। ওই একনায়কী গণতন্ত্র এতো অসামান্য ও মূল্যবান যে অন্য কারো হাতে তুলে দিলে তার মর্যাদা নষ্ট হ'তে পারে। পৃথিবী এখন এ ধরনের একনায়কী গণতন্ত্রের তীব্র সুধা পেট ভ'রে পান করে চলেছে।

এ-একনায়কেরা ষড়যন্ত্র ও নৈশ অভ্যুত্থানকে চালিয়ে দেয় 'বিপ্লব' নামে। তাই 'বিপ্লব' শব্দটির অর্থ আজকাল বিচ্ছিরিভাবে নষ্ট হ'তে চলেছে। আমার ভাগ্য খুব ভালো যে বাল্যকালেই আমি এমন একটি মহান বিপ্লব দেখতে পেয়েছিলাম। পাকিস্তান কোনো কিছুতেই পিছিয়ে ছিলো না, এগিয়ে ছিলো সব কিছুতে, এমনকি বিপ্লবেও। তাই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পাকিস্তানেই সম্ভবত প্রথম বিপ্লবের আগমন ঘটেছিলো। মহান ত্রাতা আর মহামান্য একনায়ক হিশেবে দেখা দিয়েছিলো আইউব খান। তখন ছোটো ছিলাম, তবু বুঝতে কষ্ট হয়নি যে এসব বিপ্লব চুলের মতো সামান্য

জিনিশের ওপর দিয়েই যায়। চারদিকে চুল ছাঁটো ছাঁটো রব প'ড়ে গেলো, নরসুন্দরেরা কয়েক দিন খুব ব্যস্ত সময় কাটালো, আমরা ছোটোরা বাড়িঘর পরিষ্কার ক'রে মেলিটারির পায়ের বুটের মতো ঝকঝকে ক'রে তুললাম। কিছু লোককে থানায় নিয়ে শাস্তি দেয়া হলো, কারো কারো কাঁধে আড়াইমণি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো, চাবুকের ব্যবস্থা করা হলো কারো কারো জন্যে। প্রথম বিপ্লব ছিলো বলে সেটা এতো বিপ্লবাত্মক ছিলো, পরে যারা বিপ্লব নিয়ে আসে তারা আর এতোটা বিপ্লবাত্মক ছিলো, পরে যারা বিপ্লব নিয়ে আসে তারা আর এতোটা বিপ্লবাত্মক হওয়ার সাহস করে নি। ক্ষমতা হাতে পেয়েই খুশি থেকেছে তারা; চুলটুকু ছোঁয়ার সাহস হয় নি। ছোটো বড়ো মাঝারি সব রকমের একনায়কেরাই ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। তাদের পিতারা হয়ে থাকে পুরোপুরি ব্যর্থ মানুষ। একনায়কেরা বেড়ে ওঠে মায়ের প্রবল প্রভাবের মধ্যে। আলেকজান্ডার বাল্যকালেই পিতার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে এবং মায়ের সাথে মিলে পিতাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছিলো। বহু একনায়ক বাল্যকালেই পিতাকে হারায়। কালিগুলা আর নিরো, দুই একনায়কশ্রেষ্ঠ, তাদের পিতাদের হারিয়ে ছিলো বাল্যকালেই। একনায়কেরা সাধারণত আধিপত্য বিস্তার করে এমন সব মানুষের ওপর, যাদের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত নয়। এক সময় একগোষ্ঠি মানুষ দেখতে পায় তাদের সভ্যতার প্রান্তস্থিত একটা বর্বর তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে বসেছে। আধাবর্বর মেসিডোনিয়ার রাজপুত্র আলেকজান্ডার আধিপত্য বিস্তার ক'রে সুসভ্য গ্রিকদের ওপর। আলেকজান্ডার গ্রিকদের কেউ ছিলো না, কোনো দিন গ্রিকরা ভাবেও নি যে মেসিডোনিয়া থেকে কোনো বর্বর এসে হয়ে উঠবে তাদের প্রভু। নেপোলিয়নও ফরাশি সমাজভুক্ত ছিলো না। সে ফরাশি নাগরিক হয় আকস্মিক ঘটনাবশত; তার জন্মের মাত্র কয়েক দিন আগে ফরাশিরা কর্সিকা অধিকার করেছিলো বলে নেপোলিয়ন পেয়েছিলো ফরাশি নাগরিকত্ব। ফরাশি সমাজের বহিরস্থিত নেপোলিয়ন একদিন ফরাশি সমাজের ওপর চালায় তার অবাধ স্বৈরাচার।

বহিরস্থিতদের আধিপত্য সামরিক একনায়কত্বের মধ্যে চমৎকারভাবে ধরা পড়ে। জনগণ কখনো মনে করে না যে সেনাবাহিনী একসময় তাদের প্রভু হয়ে উঠবে। দেশরক্ষার জন্যে সেনাবাহিনী লালনপালন করা হয়, এবং বিশ্বাস করা হয় যে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দেশকে রক্ষা করবে। যখন কোনো তরুণ রাজনীতিতে যোগ দেয়, তখন আশা করা যেতে পারে যে সে একদিন মন্ত্রী, এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও হ'তে পারে। কারণ তরুণটি যে-পথ নিয়েছে, সেটা মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার স্বাভাবিক রাস্তা। যে-তরুণটি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, সে একদিন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হবে এটা কেউ আশা করে না, বা সে উচ্চ আমলা হবে, তাও কেউ ভাবে না। কারণ সে ওই পথে যাত্রা করে নি। সেনাবাহিনী সমাজের প্রান্তস্থিত জনসমষ্টি, সমাজের ওপর আধিপত্য করার কোনো অধিকার তাদের নেই। যখন তারা আধিপত্য করার উদ্যোগ নেয়, তখন তারা নিজেদের সীমা অতিক্রম করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিজেদের সীমা অতিক্রমে সুদক্ষ ছিলো। শুধু সুদক্ষই ছিলো না, তাদের লক্ষ্যই ছিলো সীমা পেরিয়ে যাওয়ার। বিচারপতি কায়ানি আইউব খানের প্রতাপের

www.BDeBooks.Com

কালেই পরিহাস ক'রে বলেছিলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মহাবীর, কারণ তারা নিজেদের দেশ দখল ক'রে বসেছে। সামরিক অভ্যুত্থান দণ্ডনীয় অপরাধ, তবে এতে পাকিস্তানি অজস্র বাহিনী খুবই উৎসাহ দেখিয়েছে।

আমরা দুবার অভ্যুত্থান দেখেছি অল্প কয়েক বছরে, এবং দুজন একনায়ক পেয়েছি। এ-দুজনই কিন্তু বহিরস্থিত : একজন বেড়ে উঠেছে করাচির কোনো দরিদ্র পাড়ায়, আরেকজনও সমাজের মূল স্রোতে কখনো ঢুকতে পারে নি। তারা আধিপত্য করেছে সে মানবমণ্ডলীর ওপর, যাদের ওপর তাদের আধিপত্য করার কথা ছিলো না। কিন্তু দুজনই বেশ দাপটের সাথে দলিত করে গেলো বাঙলাদেশবাসীদের। বাঙলাদেশও পিছলে পড়লো তার স্বাভাবিক পথ থেকে। বুটের নিচে পিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। শোষণ ও দুর্নীতি অবাধ হয়ে উঠলো সারা দেশে। এখন সারাদেশেই বহিরস্থিতদের আধিপত্য: শাসনে তারা, শোষণে তারা, আমলাবৃত্তিতে তারা, দূতাবৃত্তিতে তারা। বহিরস্থিতদের প্রবল চাপে এখন বাঙলাদেশে অভ্যন্তরস্থিতরা হ'টে যেতে শুরু করেছে। এমন চলতে থাকলে একদিন পুরোপুরি হ'টে যাবে। একাত্তরে কি আমরা চেয়েছিলাম একনায়ত্ব ও বহিরস্থিতদের শাসন?

গোলামেরা

গোলামের সংখ্যা কি বাঙলায় খুব বেশি? এখানে সফল হওয়ার সবচেয়ে সহজ পথটি কি গোলাম হওয়া? অনেকেই প্রশ্ন দু'টির উত্তর দেবেন একটি ছোটো শব্দে হ্যাঁ'। চারদিকে তাকালে থরেথরে চোখে পড়ে গর্বিত গোলামদের মুখমণ্ডল। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে পাতায় পাতায় বড়ো অক্ষরে মুদ্রিত দেখি গোলামদের বিখ্যাত স্বাধীনতা অনেক মানুষের সহ্য হয় না; স্বাধীনতায় নিরাশ্রয় বোধ করে তারা। তাই তাদের দরকার পড়ে প্রভুর। প্রভুর আশ্রয়ে গোলামেরা গৌরব ও সুখে বসবাস করে। কেনো এতো গোলাম এখানে? পরাধীনতা ও একনায়কত্বের জন্যেই পলিমাটির বাঙলা ভ'রে কালে কালে বিকশিত হয়েছে গোলামেরা। বিদেশি শাসকেরা তাদের শাসিত জাতির সাথে একটিই সম্পর্ক পাতায়, তা হচ্ছে প্রভু ও গোলামের সম্পর্ক। একনায়কেরাও তাদের অনুগৃহীতদের সাথে সম্পর্ক পাতায় একটিই, সেটি হচ্ছে প্রভু ও গোলামের সম্পর্ক। এ ছাড়া আর কোনো সম্পর্কে তারা বিশ্বাস করে না। যে গোলাম হয়ে আসবে, সে আশ্রয় পাবে প্রভুর পায়ে। সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে, শক্তিতে থাকবে। শুধু একটি শর্তে; তাকে হ'তে হবে গোলাম। গোলাম প্রভুকে ভাববে নিজের বিধাতা, আর নিজেকে ভাববে প্রভুর বান্দা। শুধু ভাবলেই চলবে না; প্রতিমুহূর্তের আচরণে প্রকাশ করতে হবে সে প্রভুর গোলাম বা বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রভু তাকে সব দেবে, আর সে প্রভুর গোলাম বা বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রভু তাকে সব দেবে, আর সে প্রভুর পায়ে তুলে দেবে নিজেকে।

ঐতিহাসিক গোলামদের বিবরণের কোনো দরকার নেই; কারণ আমরা আমাদের অনৈতিহাসিক জীবনেই ভাগ্যগুণে অনেক গোলাম দেখেছি। পত্রিকার পাতায় পাতায় তাদের সুদৃশ্য ছবি দেখেছি, তাদের বাণী আমরা প্রতিদিন আস্বাদন করেছি। শুধু করেছি নয়, আজো করছি; এবং আরো অনেক দিন তাদের পুণ্য বাণী আস্বাদন ক'রে আমরা শ্রুতিফল লাভ করবো। গোলামদের বিন্যস্ত করা যায় নানা বর্গে : কেউ রাজনীতিক গোলাম, কেউ সাংস্কৃতিক গোলাম, কেউ আমলা গোলাম, কেউ সাংবাদিক গোলাম, কেউ শিক্ষাবিদ গোলাম ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন শ্রেণীর গোলাম; তবে সবাই মূলে একই—গোলাম। রাজনীতিই যেহেতু সবচেয়ে বড়ো জিনিশ জীবনে, তাই রাজনীতিক গোলামেরা খুব বড়ো হয়ে দেখা দেয়। পত্রিকা তাদের বাণী প্রকাশ করে, টেলিভিশন তাদের অভিনয় প্রদর্শন করে। প্রভুর পায়ের নিচে তারা ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকে। তাই তারাই প্রধান গোলাম। আমলা গোলামেরা খুব ধূর্ত গোলাম। সব প্রভুরই গোলামি ক'রে তারা কিন্তু বোঝাই যায় না যে গোলামি করছে। নির্বোধ গোলাম

www.BDeBooks.Com

শ্রেণীতে পড়ে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিদ গোলামেরা। ওদের পাওয়ার খুব বেশি কিছু নেই; দু-তিনটি নীরস পদে জন্যে ওরা লড়াই ক'রে শরীর ময়লা ক'রে তোলে। সাংবাদিক গোলামেরাও বেশ ঝানু, নানা সুযোগ হাতড়িয়ে নেয়; কিন্তু বোঝাই যায় না যে তারা হাতড়াচ্ছে।

প্রভু আইউব খান বাঙলায় একদল গোলাম খুঁজে পেয়েছিলো। অবশ্য তার খোঁজার কোনো প্রয়োজনই হয় নি, গোলামেরাই প্রতিযোগিতা ক'রে তার পদতলের দিকে ছুটেছিলো। প্রভু তাদের আশ্রয় দিয়েছিলো মাত্র। মোনেম খাঁ, আবদুস সবুর, ফজলুল কাদের চৌধুরী বা ফ-কা চৌধুরী প্রভু আইউবের পদতলের বিখ্যাত গোলাম। তারা বাঙলায় কয়েকটি দুর্মর গোলামবংশ সৃষ্টি ক'রে গেছে। গোলামেরা প্রভু বন্দনায় ছিলো ক্লান্তিহীন; একেকজন প্রভুর পদসেবা করার জন্যে উদ্ভাবন করতো নতুন নতুন বিশেষণ। তখনকার রাজনীতিক গোলামেরা এমন এক ধারণা সৃষ্টি করেছিলো যে পাকিস্তানের জন্যে আইউব খান অপরিহার্য। তাই তাকে তারা বানাতে চেয়েছিলো পাকিস্তানের আজীবন রাষ্ট্রপতি। আইউব খানের আশ্রিত গোলামদের বলতে পারি বাঙলার প্রথম প্রজন্মের গোলাম। দ্বিতীয় প্রজন্মের গোলামেরা উদ্ভূত হতে চেষ্টা করেছিলো মুজিবের সময়ে; কিন্তু মুজিবের গোলাম বিশেষ দরকার পড়েনি ব'লে গোলামদের বিকাশের কিছুটা বিলম্ব ঘটে। তবে একেবারে উদ্ভূত হয় নি, তাও বলা যায় না। বাকশাল আরো কিছুদিন টিকলে গোলামদের স্বতস্ফূর্ত বিকাশ চোখে পড়তো। এক শিক্ষাবিদ নাকি মালা পরাতে গিয়ে তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব'লে বন্দনা করেছিলো। ওই বন্দনার ভাষা গোলামের। এ-সময়ে এক কবি গোলাম সগর্বে বলেছিলেন, 'আমার মাকে যেন কেউ গোলামের গর্ভধারিণী বলতে না পারে'; কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা যায় সে এক নিম্নমানের সাংস্কৃতিক গোলামে পরিণত হয়েছে।

একনায়কত্বের স্বর্ণযুগে রাজনীতি বন্ধ থাকে, তাই রাজনীতিক পাওয়া যায় না; তার বদলে দেখা দেয় দলে দলে রাজনীতিক গোলাম। একনায়ক জিয়াউর রহমানের কালে দেখা যায় তাদের সাড়াজাগানো বিকাশ। এ-দল থেকে, সে-দল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলামেরা ছুটতে থাকে তার পদতল লক্ষ্য করে। গ'ড়ে তোলে একটি গোলাম দল। তাদের ভাষা গোলামের, কাজ গোলামের, সুযোগসুবিধা গোলামের। উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর পদে তারা নিযুক্ত হলেও আসলে নিযুক্ত হয় গোলামিতে। এদের কি কোনো নিজস্বতা থাকে? মোটেই না; তারা জানে যতোদিন প্রভু আশ্রয় দেবে, ততোদিন তারা দুধেভাতে থাকবে; আর যে দিন কৃপাচ্যুত হবে প্রভুর, সে-দিন বিনয়ের সাথে মেনে চলবে প্রভুর আদেশ। কে জানে কবে আবার প্রভু কৃপা করবে? তার কৃপার শেষ নেই। গোলামদের কর্তব্য কী? তারা কি রাষ্ট্র চালায়, স্থির করে নীতি, প্রণয়ন ক'রে বিধিবিধান? না, এসবের কোনো অধিকার নেই তাদের। প্রভু যা ব'লে তাতেই গলাটি বাড়িয়ে দেয়া তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। এক সমকালীন গোলাম তার দায়িত্বের কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছে সম্প্রতি। সে জানিয়েছে, তার প্রভু যদি তাকে রাস্তা ঝাঁড়ু দিতে বলে (নাকি জুতো সাফ করতে বলে?), তাহলে সে তাই করবে। কথাটি শুনে খুব বিস্মিত হলাম; কারণ সে তো রাস্তাই ঝাঁড়ু দিচ্ছে বা প্রভুর জুতোই সাফ করছে। এটা কি সে

বুঝতে পারেনি? তার মন্ত্রীত্ব আসলে কি? এটা সে বুঝতে পারে কি? তার কথায় এটা বোঝা গেলো সে গোলামি করলে অনেক সত্য বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাস্তা ঝাঁড়ু দেয়াকে ভাবে মন্ত্রীত্ব, স্তাবকতাকে মনে করে রাজনীতি।

এখন বাংলাদেশে গোলামের কিছুটা প্রাচুর্য ঘটছে। কারণ এটা তৃতীয় প্রজন্মের গোলামি। অনেক গোলাম প্রথম প্রজন্ম থেকে এসেছে, অনেক এসেছে দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে; এবং তৃতীয় প্রজন্মের গোলামও অনেক। তাই গোলামের প্রাচুর্য ঘটবেই। টেলিভিশন দেখলে বোঝা যায় অভিজ্ঞ গোলামেরাই শ্রেষ্ঠ গোলাম। একজনের চিৎকারে তো টেকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কয়েক দশক ধরে একনায়ক দেখে দেখে মনে হচ্ছে একনায়কদেরও সহ্য করা যায়, কিন্তু গোলামেরা অসহ্য। একনায়ক যা করে, নিজের জন্যে করে; আর গোলাম করে প্রভুর পায়ের জন্যে। গোলামদের কথা বলার সময় প্রভুর পা দুটি জড়িয়ে ধরার দৃশ্য এতো বেশি দেখা যায় যে আমাদের মতো সহ্যগুণে অদ্বিতীয় মনুষ্যমণ্ডলিরও তা অসহ্য হয়ে উঠেছে। গোলামদের দেখে দেখে আমার মনে হয় বাঙলার মহাকবির জন্যে সেটি রেখে গেছেন। ওই অরচিত মহাকাব্যটির নাম গোলামবন্দনাকাব্য। আশা করি বাঙলায় একবিংশ শতকে কোনো প্রতিভাবান মহাকবি জন্ম নেবেন, এবং সর্গে সর্গে গোলামদের স্তুতি করে কমপক্ষে ন-সর্গের মহাকাব্যটি রচনা করবেন। এতে তার কোনো অসুবিধা হবে না, অপরিসীম কল্পনার সাহায্য নিতে হবে না; শুধু আমাদের সময়ের ইতিহাসে কয়েক পাতা একটু পড়ে নিলেই তিনি রচনা করতে পারবেন গোলামবন্দনাকাব্যটি। সেটি বাঙলার জাতীয় মহাকাব্যরূপে পরিগণিত হবে।

www.BDeBooks.Com

সৎ মানুষদের জন্যে শোকগাথা

সৎ মানুষেরা, ব্যর্থ মানুষেরা, বাতিল মানুষেরা, আপনাদের করুণ বিষণ্ন মুখাবয়ব আমার সব সময় মনে পড়ে। আপনাদের আমরা স্বীকার করি নি; আপনাদের আমরা গ্রহণ করি নি। আপনাদের আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। আপনারা বাতিল হয়ে গেছেন আমাদের প্রফুল্ল জীবন থেকে। সৎ মানুষেরা, সততা দিয়ে আমরা কী করবো? নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে সততায়, সততায় চারপাশের আলো নিভে যায়। কী করবো আমরা গলা-চেপে-ধরা সততা দিয়ে? ব্যর্থতাকে আমরা ভয় করি, খুব ভয় করি। আমরা ছুঁতে চাই পতনের পরম পাতাল; আমরা পেতে চাই আকাশ-ফাড়া সাফল্য। ব্যর্থতা আমাদের কেউ নয়। সততা আমাদের কেউ নয়। সৎ মানুষেরা, ব্যর্থ মানুষেরা, বাতিল মানুষেরা, আপনারা আমাদের কেউ নন। অসততা আমাদের আম্মা; সফলতা আমাদের অবৈধ আব্বা। আমরা সততার নই, ব্যর্থতার নই। আপনারা যে-পথে গেছেন, তার কথা ভাবলে শিউরে উঠি আমরা। কেনো মানুষ যাবে সততার পথে? কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না আমরা। আপনারা কখনো শোনেন নি সততা খুবই দুরূহ, আর ব্যর্থতা ভয়াবহ? তবু কেনো পা বাড়ালেন ওই শ্বাপদসঙ্কুল বিপজ্জনক রাস্তায়? আপনারা কি মনোবিকলনগ্রস্ত? তাই তো আমরা ত্যাগ করেছি আপনাদের; বাতিল ক'রে দিয়েছি আপনাদের। বাঙলায় আমরা সততার স-টুকু দেখতে চাই না। সৎ মানুষেরা, ব্যর্থ মানুষেরা, আপনাদের জন্যে খুব দুঃখ হয়। যারপর নাই শোক জাগে।

খাপ না-খাওয়া মানুষেরা, আপনারা আমাদের তিরস্কার গ্রহণ করুন। আপনারা খাপ খাওয়াতে পারলেন না কারো সাথে–ব্যক্তি সাথে, সমাজের সাথে, রাষ্ট্রের সাথে, সভ্যতার সাথে। কেনো খাপ খাওয়াতে পারলেন না? জানেন না যে খাপ না-খাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ? খাপ খাওয়াতে না পেরে আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে প'ড়ে গেছেন সকলের থেকে। বিচ্ছিন্নতা আপনাদের শাস্তি, নিঃসঙ্গতা আপনাদের দণ্ড। আপনাদের রাস্তায় কেউ নেই; সামনে নেই, পেছনে নেই। আপনার প্রিয় বন্ধুটিকে আপনি সুবিধাবাদী মনে করেন? খাপ খাওয়াতে পারেন নি তার সাথে? তার থেকে তাই দূরে স'রে গেলেন? কার লাভ হলো? আপনার বন্ধুটি সিঁড়ির পর সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ওপরে উঠে গেলো। আপনি পড়ে রইলেন পাপোষের মতো। আপনি কখনো উঠতে শেখেননি। পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে যাওয়াই আপনার নিয়তি। পাশের লোকটি প্রভুপূজারী? শক্ত পা দেখলেই পুজো করতে ব'সে যায়? খাঁটি মুসলমান হয়েও খুব পৌত্তলিক? যদি সে পুজো করতে পারে নতুন নতুন প্রভুর, তাহলে আপনি পারবেন না কেনো? প্রভুর কি কোনো শেষ আছে পৃথিবীতে? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, হে সৎ মানুষ, কোথায়

প'ড়ে আছেন আপনি? আপনি কেনো খাপ খাওয়াতে পারেন না, যদি শতো শতোরা পারে? কেনো আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, যদি শতো শতোরা সংঘবদ্ধ হয় দশ দিকে? আপনি কি জানেন কোথায় আপনার অচিকিৎস্য অসুখটি? সততা-কর্কট আপনাকে নষ্ট করেছে।

উৎকোচ গ্রহণে কেনো আপনাদের দ্বিধা ছিলো, সৎ মানুষেরা? উৎকোচ তো প্রাপ্য, তা গ্রহণে কেন দ্বিধা থাকবে? সারা রাষ্ট্র আর সমাজ এগোবে কী ক'রে? আপনাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিলো মারাত্মক ক্ষতিকর সংস্কার। তার ফল আপনারা ভোগ করছেন। আপনি বনানীতে নেই বারিধারায় নেই, উত্তরায় নেই। কোথাও নেই। স্ত্রীর কাছে আপনি লাঞ্ছিত, সন্তানের কাছে অপমানিত। আপনাকে আমরা মেনে নিতে পারি না। কেনো একটু কালোবাজারিতে আপনি হাত দিলেন না? আপনার হাত কি এতোই পবিত্র যে সারা রাষ্ট্র যাতে মন ঢেলে দিয়েছে, আপনি তা ছুঁতেও ঘেন্না করেন? কালোবাজারি তো আমাদের জীবন পদ্ধতি। আপনি তার থেকে দূরে থাকবেন, জীবনপদ্ধতিতে যোগ দেবেন না, জাতীয় সংস্কৃতি পরিহার করবেন, তারপরও আপনাকে সভাপতি করবো আমরা? প্রধান অতিথি করবো, বিশেষ অতিথি? আসলে আপনি বাঙলার ব্যাকরণ পড়তেই ভুল করেছেন। কোনো সূত্র আপনি কণ্ঠস্থ করতে পারেন নি। আপনি বাঙলার সামাজিক ণত্ব-আর ষত্ব-বিধি শেখেন নি। এখন ব্যাকরণ না পড়ার মূল্য দিন, সৎ মানুষ, বাতিল মানুষ। আপনাদের জন্যে দুঃখ হয়। আপনাদের সমাধিতে কেউ একটা কাগজের ফুলও দেবে না। এ বদ্বীপে দালালি ছাড়া ফুল ফোটে না। দালালদের বাড়িগুলো কী সুন্দর! তাদের স্ত্রীরা রূপসী। সন্তানেরা পুরস্কারযোগ্য! আপনি একটু সাধের দালালিতেও যোগ দিলেন না! দালালি কি এতোই ঘৃণ্য! দালালি কি ব্রিটিশরাজের কালে উপাধির পর উপাধি পরিয়ে দেয় নি আমাদের পিতামহদের নত মস্তকে? পাকিস্তানি প্রভুরা কি দালালির জন্যে বিতরণ করে নি তমঘা? তাতে কি আমাদের পিতারা বোধ করে নি গৌরব? তাহলে আপনি কেনো একটু স্বাদেশিক দালালিও করতে পারলেন না? রাজাকার ছিলেন না একাত্তরে? খুব ভালো কথা, যদিও একাত্তরে রাজাকার হ'লেই ভালো হতো আপনার। পত্রিকায় পড়েন না মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করছে? মুক্তিযোদ্ধার বউ রাজাকার দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে? কেনো রাজাকার ভিক্ষা করছে, এটা কোনো কাগজ লেখে না। একাত্তরে রাজাকার না হ'লে যে কোনো কালে হওয়া যাবে না, তার কোনো কথা নেই। রাজাকার শুধু দশ মাসের ব্যাপারে নয়, একাত্তরের ব্যাপার নয়; এটা শাশ্বত ব্যাপার। আপনি সাতাশিতে রাজাকার হতে পারেন, সাতাত্তরে পারেন; এমন কি একবিংশ, দ্বাবিংশ শতকেও পারেন। পথ ও সরণী সব সময়ই খোলা; যে-কোনো সময় ঢুকতে পারেন। তবু কেনো ঢুকলেন না, দেখছেন না কতো মুক্তিযোদ্ধা গেরিলার পোশাক খুলে গরিলা হয়ে উঠেছে? শুধু আপনারা পারেন না, তথাকথিত সৎ মানুষেরা, ব্যর্থ মানুষেরা। আপনারাও শুধু ব্যর্থ হতে জানেন।

একটু প্রতিক্রিয়াশীল হ'লে ক্ষতি হতো না আপনাদের। পাপিষ্ঠ প্রগতির কথা কোথায় শুনেছিলেন। এখন পাপের ফল ভোগ করুন। দেশটা যদি মধ্যযুগে যায়, তাহলে আপনার কী? মধ্যযুগ কে বললো খারাপ? চোখের বদলে চোখ নিতে দ্বিধা

www.BDeBooks.Com

কেনো? কেনো দ্বিধা পাথর ছুঁড়ে মারতে? প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা পতাকা বাড়িতে, একটা গাড়িতে (আপনার তো আবার গাড়ি নেই), একটা মাথায় টাঙ্গাতে বাধলো কেনো আপনার? মানুষকে এগিয়ে নেবেন? তাই তো আপনি এতো পিছে পড়ে আছেন। ধর্মচর্চা করুন, মদ্য যতো ইচ্ছে পান করুন, লাম্পটা করুন, কিন্তু মুখে কেনো ধর্মের বুলি আবৃত্তি করবেন না? আবৃত্তিতে এতো বিরাগ আপনাদের? আপনি কেনো ধর্মান্ধতার লাউডস্পিকার হয়ে বাজতে পারলেন না? আপনি কেরো মধ্যযুগের চোঙ্গা হয়ে রাতদিন নিজেকে ফুঁকতে পারলেন না? আপনাদের জন্যে খুব বেদনা বোধ করি। সৎ মানুষেরা, ব্যর্থ মানুষেরা, বাতিল মানুষেরা, আপনাদের বিষণ্ন করুণ মুখাবয়ব মনে পড়ে। আপনারা ভুল সময়ে জন্মেছিলেন। গৌণ কবিদের একটি দোষ তাঁরা ভুল সময়ে ভুল কবিতা লেখেন, ভুল সময়ে ভুল ছন্দ লেখেন। তাঁরা ভুল কবি। আপনারা তেমনি ভুল মানুষ। ভুল সময়ে ভুল দেশে আপনারা জন্ম নিয়েছিলেন; ভুল সময়ে ভুল কাজটি করেছিলেন। তাই আপনারা বাতিল হয়ে গেছেন। কিন্তু আমার চোখ ভ'রে বুক ভ'রে শুধু আপনাদের বিষণ্ন করুণ মুখাবয়বই ভাসে আর ভাসে।

সুখে থাকুন শহীদেরা

শহীদ বুদ্ধিজীবীরা, বুকের ওপর রক্তগোলাপের মতো স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে, সুখে থাকুন আপনারা। সুখে থাকুন; কারণ আপনাদের আমরা ভুলি নি। আপনাদের অমর ক'রে রাখার জন্যে বধ্যভূমিকে আমরা তীর্থভূমিতে পরিণত করেছি। আপনারা জানেন না কতো গুরুত্বপূর্ণ হাত বছরে বছরে আপনাদের কবরে কতো মূল্যবান পুষ্পস্তবক রেখে যায়। আপনাদের বুকের ওপর কতো ফুল জমে ওঠে; কেমন বিষণ্ন করুণ সুরে রণিত হয়ে ওঠে আপনাদের স্মৃতিস্তম্ভ ও চারপাশের সবুজ। আপনাদের আমরা অমর ক'রে রেখেছি। যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে এ অমরতা আপনাদের ভাগ্যে জুটতো না। আপনারা সামান্য প্রাণ দিয়েছেন, আমরা আপনাদের অসামান্য অমরতা দিয়েছি। চোদ্দোই ডিসেম্বরে আমরা আপনাদের পোশাকের প্রদর্শনী করি বিভিন্ন একাডেমিতে; আপনাদের সহধর্মিণীরা সচিত্র সাক্ষাৎকার দেন বিভিন্ন বিনোদনমূলক সাময়িকীতে। প্রতি বছর আপনাদের ও তাঁদের ছবি ছাপা হয়। কোনো কোনো পত্রিকা অফসেটে রঙিন ছবিও ছাপে আপনাদের। আপনাদের লেখা সাধারণত আমরা পড়ি না, পড়ার মতো বিস্তর আবর্জনা এখন চারপাশে পাওয়া যায়; তবে আপনাদের শাদামাটা বইকে আমরা সহৃদয়তার সাথে 'কালজয়ী', 'চিরন্তন' প্রভৃতি বিশ্লেষণে বিশেষিত ক'রে থাকি। যখন ছিলেন আমাদের মধ্যে তখন এ-সব আপনারা পান নি; যদি থাকতেন আমাদের মধ্যে তাহলে এ-সব আমরা দিতাম না আপনাদের। লাশ আমরা খুবই পছন্দ করি; খুবই শ্রদ্ধা করি লাশকে। তাই আমরা জীবিতদের লাশে পরিণত ক'রে লাশদের জীবিত করতে চাই। আপনারা খুশি হবেন জেনে আপনাদের সমস্ত স্বপ্নকে আপনাদের দেখা ও অদেখা সমস্ত স্বপ্নকে– আমরা বাস্তবায়িত করেছি। তাই আপনারা সুখে থাকুন স্মৃতিস্তম্ভের তলদেশে।

আপনারা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন; আমরা পঞ্চান্নো হাজার বর্গমাইল জুড়ে স্বাধীনতা এনেছি। শুধু দু-দিনের জন্যে আপনারা তা দেখে যেতে পারেন নি। আপনারা যদি দেখতে পেতেন, তাহলে দেখতেন রাস্তার ভিখারিটিও স্বাধীন। তাকে আমরা ভিক্ষা করার স্বাধীনতা দিয়েছি। আপনারা শোষকদের কথা জানতে চান? হ্যাঁ, বাঙলাদেশে শোষকেরাও স্বাধীন। তাঁদের আমরা শোষণের স্বাধীনতা দিয়েছি। কেউ স্বাধীনতা পাবে, আর কেউ পাবে না, এটা তো হতে পারে না। আপনারা তাদের কথা জানতে চান, যারা আপনাদের বাসা থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলো বধ্যভূমিতে? না, তারা কেউ আর বাঙলায় নেই। আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি যে বাঙলায় আর রাজাকার নেই, আলবদর নেই, আলশামস নেই। মুক্তিযোদ্ধাও আর নেই। সবাই আমরা মিলেমিশে

www.BDeBooks.Com

একাকার হয়ে গেছি; সবাই এখন আমরা বাঙলাদেশি। এতো চমৎকার ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনারা কখনো ভাবতেও পারেন নি। আপনারা জানেন চিরকালই কল্পনার থেকে সত্য অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। আমরা সে-রোমাঞ্চের মধ্যে রয়েছি। আলবদর শব্দটি এখন আমাদের কাছে অপরিচিত। মনে হয় আলবদর ব'লে কিছুই ছিলো না কোনো কালে। এটা এক বানোয়াট অপপ্রচার।

গণতন্ত্রের জন্যে আপনারা স্মৃতিস্তম্ভের তলদেশেও উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন? তা থাকবেনই; উদ্বেগই তো বুদ্ধিজীবীর নেশা। উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, শহীদগণ; আমরা গণতন্ত্র নিয়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি। তারপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের গণতন্ত্রকে পৃথিবীর বৃহত্তম বা শ্রেষ্ঠতম গণতন্ত্র বলা যায়। এতো বড়ো সংসদভবন পৃথিবীতে আর নেই; গ্রিসে নেই; বিলেতে নেই। আমাদের গণতন্ত্র স্থাপত্যগতভাবে অনন্য, স্থানগতভাবে বিশালতম। বাঙালিরা গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এখন গৃহে গৃহে গণতন্ত্র, পথেপথে গণতন্ত্র। পাকিস্তানে এ-সব আমরা পাই নি। আপনারা তো ওই ভবনটিকে পাকিস্তানি গণতন্ত্রের মতো অসমাপ্ত দেখে গেছেন, আমার বদ্ধ লাগতো ওটি সম্পূর্ণ হ'তে। আমরা দেড় দশক লাগিয়েছি। এটা এমন কিছু বেশি সময় নয় মহাকালের তুলনায়। আপনারা বাঙলা ভাষার জন্যে পাগল ছিলেন। আমরা আপনাদের পাগলামোকে পরিতৃপ্ত করেছি। সংবিধান আমরা প্রথমে ইংরেজিতে লিখে বাঙলায় অনুবাদ করেছি; তারপর অবশ্য সংবিধানের এখানে সেখানে দরকার মতো ইংরেজি গুঁজে দিয়েছি। ইংরেজিকে আমরা অপমান ক'রে ছেড়েছি। আমাদের ইংরেজি আর বাঙলা সংবিধানের মধ্যে যদি কোনো গোল দেখা যায়, তাহলে সাধারণ পাবে বাঙলা সংবিধানটিই। দেখেছেন কীভাবে আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি ইংরেজির ওপর? এতেও আপনারা সুখী হবেন না, শহীদেরা? তাহলে কিসে সুখী হবেন আপনারা?

আমরা আপনাদের স্বপ্নকে একটু পেরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সমাজতন্ত্র আপনাদের স্বপ্নের মধ্যে ছিলো না ব'লেই হয়তো টিকলো না এখানে। কী করে টেকে বলুন, এতো চোর আর ধাউরের মধ্যে কী করে টেকে ওই স্পর্শকাতর জিনিশটা? তাই এখন বিরাষ্ট্রীয়করণের যুগ চলছে। কিন্তু দেখছি তাতেও কাজ হচ্ছে না। শুনে খুশি হবেন আপনারা এখন আমরা ঋণ পাচ্ছি খুব বেশি। চিরকাল ঋণ পায় তারাই, যাদের বিপুল বিত্ত রয়েছে। গরিবকে কে কবে ঋণ দেয়? আমরা যে এতো ঋণ পাচ্ছি, তাতেই বুঝতে পারছেন আমরা এখন ভীষণ ধনাঢ্য। এমন কি আমাদের শিশুরাও ধনাঢ্য। মাথাপিছু দু-হাজার ডলারের ঋণ নিয়েই এখন জন্ম নিচ্ছে বাঙলার প্রতিটি শিশু। বাঙালি ভ্রূণগুলোও কী মারাত্মক ধনী। গর্ভাবস্থাতেই তারা যদি ধনী না হয়, তাহলে এতো ঋণ পেলো কোথায় তারা? তবে আমাদের পুঁজিপতিরা একটুও ঋণী নয়। শুনি তারা ব্যাংক থেকে কোটিকোটি টাকা নেয়, শোধটি করার নামটি করে না। এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে এ-দেশে;– এখানে পুঁজিপতিরা গরিব, আর ভিখারিরা ধনী। পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকা ধার করে ব্যাংক থেকে, গরিব ব'লেই তো ধার করে। টাকা থাকলে কি তারা ধার করতো?

রাস্তার ভিখারিটি একটি টাকাও ধার করেনি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে। তার নিশ্চয়ই টাকা আছে, সে জন্যই সে ধার করে না। নইলে নিশ্চয়ই ধার করতো। দেখুন কি চমৎকার দেশ বানিয়েছি আমরা; গরিবেরা এখানে ধনী আর ধনীরা এখানে গরিব। এমন আর্থনীতিক রহস্যের মুখোমুখি আপনারা কখনো পড়েছেন? এরপরও সুখী হবেন না আপনারা, শহীদেরা? জানেন, এখন আমাদের এখানে প্রতিক্রিয়াশীলতা ব'লে কিছু নেই। আমরা সবাই প্রগতিশীল। যারা মধ্যযুগের দিকে দৌড় দিচ্ছি, তারা প্রগতিশীল; যারা উনিশশতকের দিকে হাঁটছি, তারাও প্রগতিশীল। একুশের দিকে যারা তাকিয়ে আছি, তারাও প্রগতিশীল। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা সবাই; মুখে রাজনীতিক কারণে ধর্মের কথা বললেও আসলে তাতে কেউ বিশ্বাস করি না। তাই সুখে থাকুন শহীদেরা। জীবিত থাকলে আপনাদের জন্যে এতো সুখের ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম না। বাঙলায় জীবিত থাকাটাই অপরিসীম অসুখ; তার চেয়ে অনেক ভালো স্মৃতি-বা বিস্মৃতি-স্তম্ভের তলে নিরাপদ নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকা। সুখে থাকুন শহীদেরা।

www.BDeBooks.Com

শ্রেষ্ঠ সময়

আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, জ্যোর্তিময় বছর কোনটি? খুব ভেবেচিন্তে, অঙ্ক ক'রে এর উত্তর দেয়ার দরকার পড়ে না; কেননা আমাদের রক্তমাংস ও ব্যর্থ স্বপ্নের ভেতরে একটি সব সময়ই জ্বলজ্বল করে। উনিশ শো একাত্তর;—আমাদের জীবনের জ্যোর্তিময় ও শ্রেষ্ঠ সময়। অপরিমেয় রক্তে ভিজেছে বাঙলাদেশের পলিমাটি, নাম পরিচয়হীন কতো লাশ পড়ে থেকেছে পথে প্রান্তরে, ভেসে গেছে নদীর বিষণ্ন জলস্রোতের সাথে, আগুনে জ্ব'লে গেছে গৃহ ও নগর ও গ্রাম, তবু ওই সময়ের মতো সময় আর কখনো আসে নি। কখনো কি আসবে ভবিষ্যতে? একাত্তরের স্মৃতি আছে যাদের বুকের ভেতরে তাদের আর কোনো স্মৃতির দরকার নেই। কেনো শ্রেষ্ঠ ওই সময়টি? বাঙালি, এর আগে ও পরে, এতো স্বাধীনতাদীপ্ত, এতো আশাঝলকিত, এতো বিশুদ্ধ বাঙালি আর কখনো হয়নি। বাঙালি বোধ হয় পুরোপুরি বাঙালি হয়ে উঠেছিলো সেই সময়। 'জয় বাঙলা' ধ্বনিটি এখন আর শোনা যায় না, ওটি কি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে? মাটি তখন বুকে ভেতর থেকে রক্তের আলোরণের ভেতর থেকে উঠে এসে শিউরে দিতো চেতনাকে, বস্তুকে, সমগ্র পরিবেশকে। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনা বাঙলা' একাত্তরে যতোটা লোকোত্তর হয়ে উঠেছিলো, ততোটা আর কখনো হয়নি। এখন গানটি কেমন সরকারি হয়ে গেছে। এখন যখন শুনি মনে হয় গলার বা যন্ত্রের আওয়াজ শুনছি, কিন্তু একাত্তরে এর সুরকে মনে হতো অলৌকিক ও অন্তরের। একাত্তরে আমরা অনুপ্রাণিত ও স্বপ্নকাতর ছিলাম, আমরা তখন দেখেছিলাম আমাদের চিরকালের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি। মানুষ যখন তার শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি দেখে, তখনি সে বাস করে তার শ্রেষ্ঠ সময়ে। একাত্তর আমাদের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন দেখা শ্রেষ্ঠ সময়।

একটি সবুজ দেশ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিলো সে-সময়, রক্তের দাগ লেগে গিয়েছিলো সব কিছুতে। আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি জাতি, শ্লোগান ছাড়া যার আর কোনো অস্ত্রই ছিলো না, সে-জাতিটি হঠাৎ যুদ্ধে গেলো একাত্তরে। তার জন্যেই ঘটলো। বড়ো বড়ো বহু ব্যাপার হঠাৎই ঘটে, অনুপ্রাণিত সবকিছুই ঘটে আকস্মিকভাবে; আমরাও অনুপ্রাণিত প্রতিভার মতো হঠাৎ একটি মহাকাব্য রচনায় লেগে গিয়েছিলাম। খুব ভেবেচিন্তে মানুষ আত্মসমর্পণ করে, আর অনুপ্রাণিত মুহূর্তে ঘোষণা করে স্বাধীনতা। বাঙালি তাই করেছিলো। আমরা কি বাধ্য হয়েছিলাম স্বাধীনতা ঘোষণায়? পাকিস্তানি দস্যুরা আমাদের ওপর চীন-আমেরিকায় তৈরি মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ব'লেই আমরা নিজেদের ঘোষণা করেছিলাম স্বাধীন? হয়তো কিছুটা

অনুপ্রাণিত হয়ে কিছুটা বাধ্য হয়ে বর্জন করেছিলাম আমরা কিম্ভূতকিমাকার পাকিস্তানকে; কিন্তু পাকিস্তানের মধ্যেই ছিলো পাকিস্তান ধ্বংসের বীজ। বাঙালি যে পাকিস্তানি হয়েছিলো, বাঙলা যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো পাকিস্তানের, এটা এক দুর্ঘটনা। একটি ধারাবাহিক দুর্ঘটনার মধ্যে মানুষ কখনো বাস করতে পারে না। তাই ওই দুর্ঘটনার সংশোধন অবধারিত ছিলো। একাত্তর হচ্ছে সাতচল্লিশের সংশোধন, পূর্ব প্রজন্ম যে ভুল করেছিলো সাতচল্লিশের পর-প্রজন্ম তারই সংশোধন সাধন করে একাত্তরে। একাত্তর তাই বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বছর। নিজেকে খুবই ধন্য বোধ করি, আমি একাত্তরের অধিবাসী ছিলাম; এ-গৌরব আজীবন বয়ে বেড়াবো রক্তে ও স্বপ্নে।

পাকিস্তানে ইতিহাস ঘাতক আর শহীদদের ইতিহাস। সাতচল্লিশ থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো ক্ষমতার ষড়যন্ত্র; সামন্ত শাসকেরা আর সশস্ত্র ক্ষমতালিপ্সুরা পাকিস্তানকে পরিণত করেছিলো নিজেদের পায়ের জুতোয়। বাঙালি পড়েছিলো বিদেশি ঔপনিবেশিকদের কবল থেকে তথাকথিত দেশি ঔপনিবেশিকদের কবলে। ভৌগোলিকভাবেও ছিলো ওটি এক অবাস্তব দেশ, সাংস্কৃতিকভাবে ছিলো পুরোপুরি বিপরীত। বাঙালিকে একদিন বের হয়ে আসতেই হতো। বায়ান্নোতেই তার সূচনা ঘটে গিয়েছিলো, তা বাস্তবায়িত হয় একাত্তরে। আমরা তখন দেখতে পাই পাকিস্তানি বা ইসলামি হিংস্রতা; কারণ পাকিস্তানি শাসকেরা ইসলামের ছদ্মবেশ পরতে সব সময়ই পারঙ্গম ছিলো। তাদেরই সহোদর এ-অঞ্চলের রাজাকারগোত্র। ধর্মের নামে কতোটা বিভ্রান্ত ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে মানুষ তা রাজাকারদের কল্যাণে আমরা দেখেছি। এ-সব দেখার খুবই দরকার ছিলো, ছদ্মবেশ খসে পড়ে উন্মোচিত হওয়ার দরকার ছিলো সত্যের। একাত্তরে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম অজস্র অকল্পনীয় সত্যের।

একাত্তর ছিলো তরুণদের একান্ত নিজস্ব বছর; এ-বছরই তারা দেখা দিয়েছিলো কিংবদন্তিরূপে। আমাদের তরুণেরা সব সময়ই দানবদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, আইউব মোনেম প্রভৃতি দানবেরা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে তরুণদের কাছেই। রাজপথে তারা রক্ত দিতে কখনো দ্বিধা করে নি। একাত্তরে তারা রাজপথ থেকে বেরিয়ে পড়ে বাঙলাদেশের সর্বত্র-নগরে, গ্রামে, বনভূমিতে। হয়ে ওঠে যোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার চয়ে গৌরবের আর কিছুই ছিলো না একাত্তরে। সেবার তারা শুধু রক্ত দিতে চায় নি, চেয়েছে শত্রুর রক্তে বাঙলাকে পবিত্র করতে। যুদ্ধে গিয়ে হৃদপিণ্ডের রক্ত উৎসর্গ করে তারা অর্জন ক'রে অসামান্য মহিমা। তখন একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা, তার চুলের ঔদ্ধত্যের দিকে তাকানোটা ছিলো পরম সুখের ব্যাপার। কতো গ্রাম গোপন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠতো যে তার মাটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ের দাগ পড়েছে, কতো সাঁকো ধ্বংস হয়ে ধন্য হয়েছে যে তার পাদদেশে মুক্তিযোদ্ধারা বিস্ফোরক পেতে রেখে গিয়েছিলো। একাত্তর এমন অসাধারণ বছর ছিলো, যখন বাঙালির স্বপ্ন জুড়ে ছিলো স্বাধীনতা আর মুক্তিযোদ্ধারা। তারা তরুণদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলো সারা বাঙলা জুড়ে।

www.BDeBooks.Com

কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়, খুব দুঃখ হয়, বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। যে-আশা স্বপ্ন ছিলো, স্বাধীনতার কালে তার বাস্তবায়নের বদলে দিক দিকে দেখা দেয় তার ব্যর্থতা। যুদ্ধে আমরা খুব চমৎকার ছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতায় সে-চমৎকারিত্ব রক্ষা করতে পারিনি। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করলেও শাসকেরা যে তাতে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, এমন মনে হয় না; বরং ক্রমশ দেখা দেয় ফ্যাশিবাদের বিকাশ। দুর্নীতি বাঙলার মাটিতে চিরকালই ছিলো, আমরা ভেবেছিলাম স্বাধীনতা উচ্ছেদ করবে দুর্নীতিকে, কিন্তু তার বদলে দুর্নীতির সম্প্রসারণই চোখে পড়ছে দিকে দিকে। এরপর ঘটে বাঙলার ইতিহাসের সবচেয়ে হিংস্র ঘটনাটি, এবং বাঙলাদেশ হঠাৎ পেছনের দিকে মুখ ফেরায়। নতুন শাসকেরা স্বাধীনতাকেই সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়ে পড়ে। চারদিকে ভয়াবহভাবে উত্থান ঘটে অন্ধকারের শক্তিরাশির, যারা পরাভূত হয়ে চুপ করে বসেছিলো তারা আবার বিষ ছড়িয়ে দেখা দেয়। বাঙলাদেশের স্বাধীনতাই সংশোধিত হয়ে যায়। দেখা দেয় রাজাকাররা, ও নবরাজাকাররা। মুক্তিযোদ্ধাদের বড়ো একটি অংশ হারিয়ে ফেলে চরিত্র, এবং বাঙলাদেশ তারা শ্রেষ্ঠ সময় থেকে বিচ্যুত হয়ে দুঃসময়ের দিকে এগিয়ে যায়।

একাত্তর এখন পরাভূত, একাত্তরের চেতনা এখন পর্যুদস্ত। চারদিকে এখন ছড়িয়ে পড়ছে একাত্তর বিরোধী প্রবণতা। কিন্তু ওই সময়কে কী ক'রে ভুলি, যে-সময় আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়, যা হয়তো আর জীবনে দ্বিতীয় বার আসবে না। তবে একাত্তর যদি পরাভূত হ'তে হ'তে বিনষ্টও হয়ে যায়, তবু বাঙলায় থাকবে এমন অসংখ্য, যাদের ভেতরে জ্বলছে একাত্তরের আগুন, যে-আগুন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সংগ্রহ করবে জীবন অগ্নি।

সিংহ ও গর্দভগণ

মানুষ সিংহের প্রশংসা করে, কিন্তু আসলে গাধাকেই পছন্দ করে। আমাদের অরণ্যে বা লোকালয়ে সিংহ নেই, এটা বিস্ময়কর মনে হয় না আমার কাছে, কিন্তু আমি খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম যখন জনৈক গাধাবিশেষজ্ঞ আমাকে জানান যে বাঙলাদেশে গাধা জন্তুটিও নেই। গাধা নেই বাঙলাদেশে, এটা কী ক'রে হ'তে পারে! আমার বিশ্বাস ছিলো গাধার সংখ্যাই এখানে বেশি। আমি অবশ্য গাধা না থাকার একটি মৌল কারণ পরে আবিষ্কার করি। কী ক'রে বিশুদ্ধ চতুষ্পদ গাধা থাকবে এখানে, চারপাশে যেখানে ছদ্মবেশী গাধাদেরই আধিক্য? কুমুদ্রা যেমন সুমুদ্রাকে হটিয়ে দেয় প্রচলন থেকে, তেমনি ছদ্মবেশী গাধাগণ প্রকৃত গাধাদের বিতাড়িত করেছে এ-ভূভাগ থেকে। খাঁটি জিনিশের উর্দ্বতনের শক্তি খুবই কম। সক্রেটিস বলেছিলেন তিনি দশ সহস্র গর্দভ দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন। খুবই ভাগ্যবান ছিলেন ওই প্রাচীন দার্শনিক। আমরা যে পরিবৃত হয়ে আছি সংখ্যাহীন গাধা দ্বারা। তিনি পরিবৃত হয়ে ছিলেন শুধু, আমরা হয়ে আছি পর্যুদস্ত। যে-দিকে তাকাই দেখি গর্বিত গাধাদের গগনচুম্বী গ্রীবা। আপনার কর্মস্থলটি, আবাসিক এলাকটি, বন্ধুর সংস্থাটি দেখুন; মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় দেখুন; কোথাও আপনি বিশিষ্ট সিংহ খুঁজে পাবেন না। দেখবেন সমস্ত উজ্জ্বল কক্ষ ও প্রোজ্জ্বল আসন অধিকার ক'রে আছেন বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্ট গর্দভ। যে এক আধজনের মধ্যে সিংহ হওয়ার প্রতিভা ছিলো গাধাদের মিলিত চক্রান্তে তারা শুরুতেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। চারদিকে এখন গাধাদের জয়জয়কার। তাদের মহিমায় প্রতিবেশ পুলকিত, ধরণী ধন্য, আর পৃথিবী পরিক্রমণরত।

যদি আপনার ভেতরে সিংহের অনুস্বরটুকুও থাকে, তাহলে আপনি জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবেন। যদি আপনার ভেতরে গাধার গটুকু থাকে, তাহলে আপনার জীবন গৌরবে গর্বিত হয়ে উঠবে। আপনাকে পেরিয়ে যারা ওপরে উঠে গেছে, তাদের দেখে এটা আপনার বুঝে ফেলার কথা। মনে করা যাক আপনি পদোন্নতির আশায় এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার বুঝে নিতে হবে সাক্ষাৎকার নেবেন কয়েকজন মাননীয় গর্দভ। যদি তারা কোনো রকম আভাস পান যে আপনার মধ্যে সিংহের ছিটোফোঁটা রয়ে গেছে, তবে আপনার সব কিছু ঝরেঝরে। যে নিচে ছিলেন আপনি, সেখানেই আপনাকে পচতে হবে। ওইসব সাক্ষাৎকারে কী বিচার করেন মাননীয়রা? আপনার কি তা জানা নেই? তারা খোঁজেন আপনার লেজটি কেমন? যদি দেখেন আপনার পেছনে একটি গাধার লেজ রয়েছে, অমনি তাঁরা আপনাকে বাছাই করে নিতে উদ্যত হবেন। আপনার কান দুটি নেড়েচেড়ে যদি দেখেন আপনার গাধাত্ব

www.BDeBooks.Com

নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ আপনার উন্নতি ঘ'টে যাবে। কারণ বিশ্বলোকে গাধাই জনপ্রিয়তম ও বিশ্বস্ততম। সিংহ ভয়াবহ। আপনি যদি সিংহ হন তাহলে আপনাকে দিয়ে কোনো ভার বহানো সম্ভব হবে না। সিংহের আর যে-গুণই থাক, ভারবহনের খ্যাতি নেই। গাধার খ্যাতিই ভারবাহী হিশেবে। তাই বড়ো গাধারা যারা ভার বয়ে বিখ্যাত গাধা হয়েছেন, তারা নির্বাচনের সময় খুঁজে নেন ভারবাহী বিনীত গাধাদের। মনে করা যাক আপনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন (কীভাবে হয়েছেন আমি তা জানি না)। আপনার একরাশ উপ-, ও প্রতি-, ও পুরো-মন্ত্রী দরকার। আপনি কাদের নিবেন? সিংহদের? সিংহদের নিয়ে কি স্বস্তিতে থাকতে পারবেন আপনি? পারবেন না। তাই আপনি গাধা খুঁজবেন। একরাশ মুলো ছড়িয়ে দিলেই দেখবেন কীভাবে প্রতিযোগিতা ক'রে এসে উপস্থিত হয়েছে গাধাবৃন্দ। আপনার মুলো খেয়ে তারা আপনার সব ভার বহন করবে। সিংহ দিয়ে কি তা পারবেন? পারবেন না। তাই সিংহদের শিকল পরিয়ে স্বস্তিতে থাকার চেষ্টা করবেন। বা মনে করা যাক আপনি ভেদরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য অনেক প্রাণী দরকার। দেখবেন গাধারা এগিয়ে এসে আপনার গোয়াল ভ'রে ফেলেছে। আপনি একের পর এক গাধা মনোনীত করতে থাকবেন, এবং গাধা পরিবৃত হয়ে সুখ শান্তিতে সময় কাটাবেন। ওখানে জ্ঞান চর্চা হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা ভাবার সময় আপনার নেই; কারণ আপনার প্রিয় মনোনীত গাধাবৃন্দ সকাল-দুপুর-বিকেলে এসে বিভিন্ন স্বাদের মুলোর জন্য তদবির করতে থাকবেন। এমনভাবে একেকজন ডেকে উঠবেন যে আপনার হৃদয় সুখে ভ'রে যাবে। গাধাদের টিকে থাকারও রয়েছে সহজাত প্রতিভা। একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনিয়েছিলেন, যা আমার বুকের ভেতর ছুরিকার মতো গেঁথে আছে। তার দলের মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি রাজাকার ধ'রে এনে প্রধানের কাছে উপস্থিত করে। প্রধানের দায়িত্ব রাজাকার তিনটির শাস্তিবিধান করা। তিনি দেখলেন একটি রাজাকার খুবই বুদ্ধিমান, সিংহ ধরনের, অপর দুটি পুরোপুরি গাধা। তিনি আদেশ দিলেন বুদ্ধিমানটিকে হত্যা করো, আর গাধা দুটিকে ছেড়ে দাও। কারণ এ-গাধা দুটি কিছুই করতে পারবে না। এভাবেই সিংহরা নিহিত হয় আর গাধারা বেঁচে থাকে। গল্পটির তাৎপর্য আমাকে প্রতিদিন ভাবায়; গাধারা টিকে থাকবে, সিংহরা অর্জন করবে মৃত্যু।

গৃহীত গোলাম গাধারা দ্বিচারিত্রিক। কার আর সব গাধা হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে? একটু সিংহ হতে কি ইচ্ছে করে না? প্রভুর কাছে তারা গোলাম ও গাধা, সুন্দরভাবে ডেকে ওঠে;– হ্যাঁ স্যার, জি স্যার, হ্যাঁ স্যার, জি স্যার, স্যার, স্যার, স্যার।' অভিধানের এ-কটি শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দেরই দরকার পড়ে না তাদের। গাধার বাস্তব ও স্বপ্নলোকের সমস্ত অর্থ সংহত হয়ে আছে এ-শব্দগুচ্ছেই। গাধারা যদি সব সময় গাধা হয়েই থাকতো তাহলে খারাপ হতো না। কিন্তু তাদের সিংহ হওয়ারও রয়েছে প্রবল বাসনা। তাই প্রভুর কাছ থেকে, গোয়াল থেকে যেই বেরিয়ে আসে তারা, অমনি তারা পরিধান করে লোকশ্রুত সিংহচর্মটি। হয়ে ওঠে সিংহ। ভেজাল বস্তু খুবই মারাত্মক, সিংহ চর্মাবৃত গর্দবৃত গর্দভও ভয়াবহ। সিংহের মতো ঘুরতে থাকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এর ওপরে, থাবা দেয় ওর ঘাড়ে রক্ত শোষণ করে আর একজনের।

অর্থাৎ শুরু হয়ে যায় পশ্যান্যায়। গর্জন করতে থাকে সব সময়, এমন কি প্রেমালাপের সময়ও ওই গর্জন স্তব্ধ হয় না। নকল জিনিশের এটাই মহিমা। গাধা দেখে দেখে আমি গাধার মোহে ও প্রেমে পড়েছি। বার বার ইচ্ছে হয় গাধা হই, গাধা হয়ে জন্ম লাভে ব্যাকুল বাসনা আমাকে বিহ্বল করে। যদি হ'তে পারতাম, যদি গাধা হতাম তা হ'লে কতো কী থাকতো আমার। ঝকঝকে তলোয়ারের মতো ক্ষমতা থাকতো, প্রাসাদের মতো গৃহ থাকতো, আমাকে দেখলে কৃপাপ্রার্থীরা মহাবিনয়ে লাফিয়ে উঠে অভিবাদন জানাতো, আমাকে দেখলে কৃপাপ্রার্থীরা মহাবিনয়ে লাফিয়ে উঠে অভিবাদন জানাতো; আর যাদের আমি পাইনি, তাদের চিত্ত দাউদাউ ক'রে জ্বলতো। একটা পরামর্শ দিতে ইচ্ছে করে আমার; আপনারা কেউ সিংহ হ'তে চাইবেন না। আপনাদের সন্তানদের ওপর কড়া নজর রাখবেন, যাতে তারা আবার সিংহ হওয়ার মোহে না পড়ে। বাল্যকালের বাঙলা বইগুলো সিংহ হওয়ার প্ররোচনা দেয়। ওগুলো থেকে সাবধান থাকবেন। সুন্দরভাবে শেখাবেন কী ক'রে গাধা হ'তে হয়, লেজ দোলাতে হয়, প্রভুকে দেখলে ডেকে উঠতে হয়, আর সময় মতো সিংহচর্মে সাজতে হয়। গাধার একটা বড়ো ছবি তার ঘরে টাঙিয়ে রাখবেন, তাকে প্রার্থনা করতে শেখাবেন, 'হে মহিমামণ্ডিত গাধা, সুদর্শন গর্দভ, আমাকে তোমার মতো প্রতিভা দাও। আমি যেনো তোমার মতো সুদর্শন গর্দভ হয়ে উঠতে পারি।' এটা হোক জাতীয় প্রার্থনা।

www.BDeBooks.Com

কতো রক্ত বৃথা গেলো হিশেব রাখি নি

বাঙলাদেশের শ্লোগানে, কবিতায়, এমনকি জীবনে বহুব্যবহৃত শব্দগুলোর একটি হচ্ছে 'রক্ত'। একটু উত্তেজিত হ'লেই আমরা রক্তের কথা বলি। রক্তের রূপকে কবিতা ও শ্লোগান অনেক দশক ধ'রে রঞ্জিত হয়ে আছে। জননেতা জনতার কাছে আবেদন জানায়– 'রক্ত দাও'; ছাত্ররা দেয়ালে দেয়ালে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে রাখে– 'আমরা রাজপথ রাঙাই ... রক্তে।' রক্ত আমাদের তীব্রতম রূপক ও প্রতীক;' বহুব্যবহারে এখন শব্দটি কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, কিন্তু শিউরে দেয় তাদের হৃদয়, যারা এখনও মানবিকতাকে পুরোপুরি পরিহার করতে পারেনি। রক্ত নিয়ে আমরা যে-উল্লাস প্রকাশ করছি কয়েক দশক ধ'রে, যেভাবে অপচয় ক'রে চলছি রক্তের, তা আমাদের গভীর রোগেরই প্রকাশ। আমরা সম্ভবত জীবনের মূল্যই বুঝি না। বড়োই উত্তেজিত আমরা; ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ, বন্যা, রক্ত প্রভৃতি তীব্রতার প্রতি আমাদের মোহের শেষ নেই। চরম আমাদের অবলীলায় আকর্ষণ করে। বাঙলার মাটিতে যে কতো রক্ত ঝরেছে, তার কোনো হিশেব আমরা রাখি নি; রক্ত বাঙলার সবচেয়ে সুলভ শস্তা বস্তু হয়ে উঠেছে। উনসত্তরের রক্তপাত আমি দেখেছি। তখন বাঙলার মাটিকে আমার মনে হয়েছিলো ব্লাডব্যাংক'; মনে হয়েছিলো যে দিগদিগন্ত থেকে জনতা এসে বাঙলার মাটির ব্লাডব্যাংকে রক্ত জমা রেখে যাচ্ছে, যেখান থেকে একদিন সমগ্র জাতি রক্ত সংগ্রহ করবে। তারপর মহারক্তপাতের সময় এসেছিলো একাত্তরে, সফল হয়েছিলো রক্ত। কিন্তু তারপর থেকেই আবার ব্যর্থ হ'তে থাকে রক্ত। তরুণদের মিছিলে সব সময়ই রক্ত ব্যর্থ হতে না দেয়ার ঘোষণা শুনি, ওই ঘোষণা প্রতিদিন ধ্বনিত হয় বাঙলার শহরগ্রামে, তবে পরিহাসের মতো মনে হয় ওই শপথকে। কেননা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দেখছি রক্তের অপচয় ও ব্যর্থতা। রক্তের এমন অপচয় সম্ভবত আর কোথাও ঘটে না বিশ্ববিদ্যালয় এখন হয়ে উঠেছে রক্ত অপচয়ের এলাকা, ব্যর্থ রক্তের কালো রঙে বিশ্ববিদ্যালয় এখন মলিন। প্রতিাসেই কারো-না-কারো হৃদপিণ্ডের রক্ত ফিনকি দিয়ে ছোটে, উদ্দেশ্যহীনভাবে বয়ে চলে ছাত্রাবাসের বারান্দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়কে। রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন* নাটকের কথা মনে পড়ে; সেখানে বারবার শোনা যায় দেবী রক্ত চায়, দেবী রক্ত চায়। বিশ্ববিদ্যালয় কি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের রক্তপিপাসু দেবী? বিদ্যার্থীদের বিদ্যা দেয়ার বদলে তাদের রক্ত পান ক'রে মহিমান্বিত হতে চায় মাতা বিশ্ববিদ্যালয়? তবে ওই নাটকেই আমরা জেনেছি দেবী রক্ত চায় নি, চেয়েছে অন্যরা, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে দেবীর নামে দাবি করেছে রক্ত। বাঙলার বর্তমান রঘুপতিরা নিজেদের স্বার্থে রক্তপাত ঘটিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন এক স্থানে

যেখানে রক্তচর্চা হওয়ার কথা নয়; চর্চা হওয়ার কথা জ্ঞান। জ্ঞানের কোনো রঙ যদি কল্পনা করি, তবে তা হবে শুভ্র; কিন্তু এখানে শুভ্র পদ্মের বদলে বিভীষিকা জাগিয়ে ফুটছে ভয়ানক রক্তজবা। পুত্রকন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে প্রতিমুহূর্তে উৎকণ্ঠিত থাকেন পিতামাতারা, ভয়ে থাকেন, হয়তো তাঁদের সন্তান ফিরে আসবে লাশ হয়ে; তাদের কপালে হয়তো থাকবে গুলির ক্ষত, বা বুকে থাকবে ছুরিকার হিংস্রতা। বিশ্ববিদ্যালয় কি দীক্ষা দিচ্ছে তার বিদ্যার্থীদের; বরং বর্তমানের চরম জ্ঞানবিরোধিতার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানকেই প্রধান ক'রে তুলে ধরছে। তবু তার চত্বরই হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত; তার শুভ্র পাপড়িই হয়ে উঠছে রক্তমাখা; তার বুকের ওপরই গড়িয়ে চলছে তারই সন্তানের হৃদপিণ্ডের রক্ত। অপব্যয়ী রক্তের দাগ লেগে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মায় স্বাধীনতার বছরগুলোতে কতো রক্ত বৃথা গেছে কেউ তার হিশেব রাখে নি; কিন্তু মিছিলে অভ্যাসবশতই ধ্বনি ওঠে যে রক্ত বৃথা যেতে দেয়া হবে না। আমি ওই স্বর প্রায় প্রতিদিন শুনি; কলাভবনের বারান্দায় শুনি, সড়কে শুনি; তবে ওই শ্লোগানকে আমার শপথ ব'লে মনে হয় না, ওই স্বর আমার বুকে এসে বিলাপের মতো বাজে। শ্লোগান এখন বিলাপে পরিণত হয়েছে। তাদের শ্লোগান শুনে মনে হয় রক্তের সফলতায় তারা খুব বিশ্বাসী নয়; ভবিষ্যৎ রক্তপাতের ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত, যেনো তারা জানে রক্তপাতের সম্ভাবনা অশেষ। যে ছুরিকা ও আগ্নেয়াস্ত্র চালায়; ছুরিকা ও আগ্নেয়াস্ত্র ওঠে তার শত্রুদেরও হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাই দেখা যাচ্ছে। এসব ছুরিকা ও আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস সম্পর্কে নানা মত রয়েছে, তবে গন্তব্য হয়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়। একটু শুভবুদ্ধি কি আশা করতে পারি না যে তারাও বুঝবেন জীবনের মূল্য? এখন হয়তো বোঝার সময় এসে গেছে যে রক্তমাত্রই সফল হয় না, বরং রক্তের অপচয়ই হয় বেশি; যে-রক্ত মাটিতে ঝ'রে পড়ে তা ব্যর্থ। আমরা লাশের পর লাশ দেখেছি, অনেক লাশ আমরা দেখিনি, অনেক পরিবার জানতেও পারেনি তাদের প্রিয় কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি কোনো সুফল ফলেছে? সফলতায় ভ'রে উঠেছে বাঙলা? মিছিল থেকে ফিরে আসে নি অনেকে, তাদের অনেকের নামও জানি না আমরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অধিকাংশই সক্রিয় রাজনীতির সাথে জড়িত নয়, তবে তারা হয়তো সমর্থন করে কোনো না-কোনো দল, কিন্তু তারা রক্তের অপচয়ে উৎসাহী নয়। রক্তের অপচয় অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। এটা প্রথমে বুঝতে হবে তাদের যারা এর শিকার। প্রতিটি ছাত্রকে, প্রতিটি ছাত্রদলের প্রতিটি কর্মী ও নেতাকে বুঝতে হবে তারা এক ষড়যন্ত্রের শিকার; বুঝতে হবে অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে তাদের রক্তকণিকা লক্ষ্য ক'রে। যার হাতে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উঠেছে, ঝকঝকে আগ্নেয়াস্ত্রের বারুদের সাহচর্যে যে নিজেকে শক্তিমান ভাবছে, যে আগ্নেয়াস্ত্রটিকে ভাবছে নিজের দাস ও নিজেকে ভাবছে প্রভু, তাকে বুঝতে হবে সে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভু নয়, দাস। বুঝতে হবে সে ওই অস্ত্রের শিকার। বুঝতে হবে যে-অস্ত্রটি আমি মুঠোতে তুললাম, তার নল আমারই হৃদপিণ্ডের দিকে তাক করা, এর ক্রোধে একদিন আমিই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবো। অস্ত্র বন্ধু নয় শত্রু। বুঝতে হবে রক্তের মূল্যে; বুঝতে হবে যে রক্ত ঝ'রে যায়, তা কখনো সফল হয় না। শহীদে দেশ ভ'রে গেছে, আর শহীদ আমরা চাই না; আমরা

www.BDeBooks.Com

জীবিত মানুষ চাই। প্রাণ দেয়াকে এখানে বড়ো বেশি মহিমান্বিত করা হয়েছে, বুকে গুলি লাগার অনেক গৌরব করা হয়েছে গল্পকবিতায়, ভাবাবেগপূর্ণ অসংখ্য কবিতায় মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়া হয়েছে শহীদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে দেখে; জননেতাদের জাগণে রক্তপাতকে গোলাপ ফোটার মতো রঙিন ক'রে তোলা হয়েছে। বড়ো বেশি ভীরু, বড়ো বেশি প্রচণ্ড জীবন যাপন করছি আমরা, যার ফল দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাষ্ট্রযন্ত্র যে রঘুপতির ভূমিকা পালন করছে, মানবিক সব কিছুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে চলছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তাই সাবধান থাকা দরকার সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর যাতে এক ফোঁটা রক্তও অপচয়িত না হয়, তার জন্য শপথ নিতে হবে। দু দশকে কতো রক্ত বৃথা গেছে, কতো গোলাপ ঝরেছে অকালে, তার আমরা হিশেব রাখি নি। এখন হিশেব রাখতে হবে প্রতিটি রক্তকণিকার—রক্ত বইবে প্রাণবন্ত হৃদপিণ্ডে, আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রোধে তার একটি কণিকারও যেনো অপচয় না ঘটে। তার একটি কণাও যেনো ঝরে না পড়ে মাটিতে।

আলবদরেরা

ডিসেম্বর এলে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মুখ অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, বিষণ্ন বুকের ভেতরে কুয়াশার মতো ভাসতে থাকে কারো মুখ, ছায়া হাসির রেখা, হাত নাড়া ও অভিবাদনের ভঙ্গি; আর দু-চোখে যেনো স্পষ্ট দেখতে পাই আলবদরদের, যদিও কোনো আলবদরের বিকট মুখ আমি দেখিনি। আলবদরের মুখ একবার যে দেখে সে আর কখনো কিছু দেখে না। শয়তানের মুখ যেমন কখনো কেউ দেখেনি, হয়তো তেমনি আলবদরের মুখও দেখেনি কেউ। শয়তান ও আলবদর দুই-ই মুখোশ প'রে আসে; এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের পর আর কারো সাথে সাক্ষাতের দরকার পড়ে না। শহীদদের মনে হয় খুবই সুদূর, দেড় যুগ আগে কোনো এক বিকেল, বা দুপুরে, ভোরে বা সন্ধ্যায় তাঁরা অনুপস্থিত হয়ে গেছেন, চির নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন; তাদের মুখ ঝাপসা হয়ে গেছে সমস্ত দর্পণে। কিন্তু আলবদরেরা উপস্থিত চারপাশে, প'রে আছে তারা একাত্তরের ডিসেম্বরের মুখোশ, চিনতে পারছি না তাদের, কিন্তু তারা খুবই সক্রিয়; তাই তাদের বিকট মুখ দেখতে পাই প্রতিদিনের দু:স্বপ্নে। গলির কোণে হঠাৎ দেখতে পাই তাদের মুখোশ, টিভিতে দেখতে পাই সে-মুখোশ, সংবাদপত্রে দেখতে পাই কুৎসিত মুখোশ, দেশের চারিদিকে দেখতে পাই বাঙলাদেশের কু ক্লাক্স ক্লানদের কালো মুখোশ, চোখ বুজলে দেখতে পাই মুখোশপরা ঘাতকদের জিপ ছুটে চলেছে ডিসেম্বরের ঢাকার সড়কে, গলিতে, উপগলিতে; ধাক্কা দিচ্ছে দরোজায় দরোজায়, মিলিয়ে নিচ্ছে ঠিকানা, ঢুকছে ড্রয়িংরুমে। দেখতে পাই আলবদরের গাড়ি এসে থামলো মুনীর চৌধুরীর বাড়ির দরোজায়, কয়েকজন ঢুকলো তাঁর বাড়িতে, দেখতে পাই তারা টেনেহেঁচড়ে মেধাবী মুনীর চৌধুরীকে তুলছে জিপে, তাঁর চোখ বেঁধে দিচ্ছে চিরকালের জন্যে; তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে স্ত্রীর মুখ, পুত্রের চিবুক, সারি সারি গ্রন্থ, লিখিত ও অলিখিত নাটকের দৃশ্য, ও বাঙলাদেশ। দেখতে পাই জিপ ছুটে চলেছে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ফ্ল্যাটের দিকে, তাঁকে না পেয়ে তাঁর খোঁজে ছুটছে অন্য ঠিকানায়, ঢুকছে ঘাতকেরা গৃহের ভেতরে, টেনে বের ক'রে আনছে তাঁকে, ঠেসে চোখ বেঁধে তাঁর চোখ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে সমস্ত রাবীন্দ্রিক রৌদ্র, শিশুপুত্রদের মুখের জ্যোৎস্না, গীতবিতানের পাতা, বাঙলার পুষ্পপল্লব। দেখতে পাই ঘাতকদের জিপ গোঁ গোঁ করে ছুটছে উদ্বাস্তু আনোয়ার পাশার বিবর্ণ ফ্ল্যাটের দিকে, তাঁকে টেনে নামাচ্ছে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে সদাশংকিত আনোয়ার পাশার চোখ, আর ওই চোখ শক্ত ক'রে ঘাতকেরা বেঁধে দিচ্ছে মৃত্যুর মতো অন্ধকারে। তারপর জিপ ছুটে চলছে ঔপন্যাসিকের বাসায়, চিকিৎসকের বাড়িতে। দেখতে পাই ডিসেম্বরের ঢাকার অলিতেগলিতে, রাস্তায়

www.BDeBooks.Com

রাস্তায় ছুটে চলছে আলবদরদের মধ্যযুগসজ্জিত জিপ, দেখতে পাই জিপের পর জিপ চলছে মীরপুরের বধ্যভূমির দিকে। ওই জিপে অন্ধ ব'সে আছেন তাঁরা যাঁদের চোখ ও হৃদয় ছিলো সবচেয়ে আলোকিত।

প্রতিটি জাতির কিছু মহৎ মানুষ থাকা দরকার; একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের প্রতিভার জন্যে উল্লেখযোগ্য, তবে প্রাণ দিয়ে তাঁরা মহত্ত্ব অর্জন ক'রে গেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে এক দিনে এতো বুদ্ধিজীবীকে ঘাতকসংঘের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে প্রাণ দিতে হয় নি। হিটলারের জার্মানিতেও ঘটেনি এমন ঘটনা। তা ঘটেছে ইসলামি পাকিস্তানে, ঘটিয়েছে ইসলামের অন্ধ ধারক বাহকেরা। ধর্মান্ধরা ধর্ম থেকে কতোটা দূরে চ'লে যেতে পারে, কতোটা অধঃপতন ঘটাতে পারে ধর্মের, তার উদাহরণ একাত্তরের চোদ্দই ডিসেম্বরের ঘটনা। ইতিহাসে তারা চিরকালের জন্যে কলঙ্কিত হয়েছে, এবং এ-অঞ্চলে চিরকালের জন্যে কলঙ্কিত করেছে এক কালের সদর্থক শব্দ 'আলবদর'কে। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা যে সবাই সক্রিয় ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, এমন নয়; কেউ কেউ হয়তো জীবিত থাকলে স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোতে বেশ বিব্রত জীবন যাপন করতেন, কিন্তু তাঁরা যে প্রগতির পক্ষের মানুষ ছিলেন, এটাই তাঁদের বড়ো অপরাধ ছিলো আলবদর বাহিনীর কাছে। আলবদরেরা সব সহজ করতে পারে; শোষণ, পীড়ন, শ্লীলতাহানি, চরিত্রহীনতা কোনো কিছুই তাদের চোখে অন্যায় নয়, তাদের চোখের বিষ হচ্ছে প্রগতিশীলতা। তাই তারা উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলো বাঙলার প্রগতিশীলতার প্রতিটি শেকড়। বুদ্ধিজীবীদের ওপর জাতক্রোধ ছিলো পাকিস্তানি শাসকসম্প্রদায় ও তাদের পালিত ঘাতকদের; কেননা বাঙলায় বুদ্ধিজীবীরাই বারবার উৎপাত বাঁধিয়েছেন। অবশ্য একটি দালাল বুদ্ধিজীবীগোত্র পাকিস্তানি শাসকেরা পেয়েছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই। বায়ান্নোর অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে যে-বুদ্ধিজীবীরা এগোচ্ছিলেন, তাঁরাই ছিলেন পাকিস্তানের সন্দেহের স্থল; আর একাত্তরের চোদ্দই ডিসেম্বরের প্রাণ দিতে হয়েছিলো প্রধানত তাঁদেরই। আলবদরেরা ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখে বাঙলার বুকে নিভিয়ে দিতে চিয়েছিলো বায়ান্নোর একুশের অগ্নিশিখা।

বুদ্ধিজীবীরা শহীদ হয়েছেন, শহীদ হয়েছে আরো অসংখ্য বাঙালি। বাঙালি তার ইতিহাসের একটি যুদ্ধেই জয়ী হয়েছিলো, কিন্তু বাঙালি নিয়তি এমন পরিহাসপরায়ণ যে জয়ী হয়েও বাঙালি পরাভূত হয়ে গেছে। বাঙালি যা কিছু চেয়েছিলো তার সব কিছুই বাতিল ক'রে দেয়া হয়েছে; তার সমস্ত অর্জনই গত কয়েক বছরে সংশোধিত হয়ে গেছে। বাঙলাদেশ এখন পাকিস্তানের চেয়েও প্রগতিবিরোধী। এখন পাকিস্তানে হয়তো কোনো আলবদর নেই, তবে বাঙলাদেশে আলবদরেরা বড়োই সক্রিয়। যে-অন্ধকার যুগ ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে, প্রগতিশীলতা যেভাবে নিহত হচ্ছে প্রতিদিন, তাতে আবার যদি কোনো নতুন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস দেখা দেয়, তাহলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। 'জাতি ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করে নি'র মতো আলবদরি শ্লোগান বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা দেখা যায় ঢাকা শহরের দেয়ালে। এ-শ্লোগান নিশ্চয়ই আলবদরের গলা থেকে উচ্চারিত। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এখন চলছে পুরোদমে; প্রগতির কথা

প্রকাশ্যে বলতে অনেকেই ভয় পায়, কিন্তু মধ্যযুগীয় কথা উচ্চারিত আর মুদ্রিত হয় বড়ো গলায় ও অক্ষরে। বাঙলায় ব্যর্থ হয়ে গেছে অসংখ্য মানুষের রক্ত, ও বুদ্ধিজীবীদের প্রাণদান। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে করে, শহীদগণ, আপনাদের রক্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে, আপনাদের প্রাণ দেয়াটা ইতিহাসের বড়ো অপচয়। আপনারা তাকিয়ে দেখুন, আপনাদের ঘাতকেরা চমৎকার আছে বাঙলাদেশে, তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের। বায়ান্নোর সন্তানদের রক্তে তাদের পিপাসা মেটে নি, তারা একাত্তরের সন্তানদের রক্তের তৃষ্ণায় কাতর।

আলবদরদের প্রতিরোধ করার উপায় প্রগতিশীল রাজনীতি। রাষ্ট্রযন্ত্র এখন প্রগতিবিরোধী, তার অপার উৎসাহ সমস্ত প্রগতিবিরোধী কাজে। সমাজতন্ত্র আজ পরিহাসের বিষয়, গণতন্ত্র হাস্যকর উপকথা; ধর্মের অভাব এখন মেটানো হচ্ছে ধর্মান্ধতা দিয়ে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে হিংস্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে আলবদরেরা। বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি এখনো তাদের জিপ ছোটা শুরু করে নি, তবে তারা জিপ সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছে; অনেক জিপ সংগ্রহ করেছে। যদি প্রতিক্রিয়াশীলতা এমনভাবে ঘন থেকে ঘনতর হ'তে থাকে, তবে অচিরেই তারা বেরিয়ে পড়বে। মুখোশ প'রে ঢুকবে কোনো নতুন মুনীর চৌধুরীর বাড়িতে, চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে যাবে; তারা মুখোশ পরে ঢুকবে এ-সময়ের মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশার বাড়িতে, টেনেহেঁচড়ে তুলবে জিপে, চিরকালের জন্যে চোখ বেঁধে দেবে। এ-বারের শহীদদের লাশও পাওয়া যাবে না।

আলবদরেরা এখন আগের থেকে অনেক শক্তিমান, অনেক বেশি সময় তারা পাবে এবার; ওই সময়ে তারা শুধু শহীদদের লাশের চিহ্ন মুছে দেবে না, বাঙলার আকাশ ও মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে প্রগতিশীলতা। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি বুকে ধ'রে রাখার মতোও কেউ থাকবে না। বাঙলাদেশ হবে আলবদরদেশ।

www.BDeBooks.Com

স্বৈরপর্বে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা

স্বৈরচারীরা যখন দেশ দখল করে, তখন প্রথমেই তারা নিষিদ্ধ করে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার। বৈধ সমস্ত কিছু অবৈধ, আর অবৈধ সমস্ত কিছু বৈধ হয়ে ওঠে স্বৈরপর্বে, যদিও স্বৈরশাসকেরা নিজেরাই অবৈধ। ওই পর্বে কোনো নাগরিক অধিকার থাকে না জনগণের, থাকে না কোনো স্বাধীনতা; শুধু অবৈধ একদল স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে। আমাদের দেশে তথাকথিত স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা নেই। যে-কোনো মানুষকে এখানে অন্যায়ভাবে পীড়ন করা যায়, এবং নিয়মিতভাবে পীড়ন করা হয়। প্রতিদিনই পত্রিকায় পুলিশের পীড়নের সংবাদ বেরোয়; পুলিশ কাউকে অন্যায়ভাবে ধ'রে নিয়ে গেছে, ঘুষের জন্যে নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, মেরে ফেলেছে, এমন সংবাদ কাগজে আসে; তবে তার কোনো প্রতিকার সাধারণত হয় না। প্রতিকার পরের ব্যাপার; পুলিশ যে কাউকে এমনভাবে ধ'রে নিতে ও নির্যাতন করতে পারে, এতেই বোঝা যায় আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতায় মারাত্মক মাটতি রয়েছে। পুলিশ আমাদের দেশে পীড়নযন্ত্র; জনগণের নাগরিক অধিকার নেই বলে পুলিশ এমন পীড়ন চালাতে পারে। 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' নামে একটি বেআইন রয়েছে এখানে, যা নাগরিকের কোনো অধিকার স্বীকার করে না। ওই বেআইনে যাকে-তাকে ধ'রে নোংরা দেয়ালের ভেতরে ভ'রে রাখা যায়, আর রাখা হয়। এ-বেআইনটি এখন বড়ো কর্তাদের ঘুষ খাওয়ার একটি বড়ো উপায়। পত্রিকা বন্ধ করার জন্যে রয়েছে বেআইন, সরকার এটা দিয়ে মাঝেমাঝেই গলা চেপে ধ'রে পত্রপত্রিকার। রাষ্ট্র যখন অন্ধ বধির বুলডোজারের হয়ে ওঠে, তখন প্রতিটি নাগরিক হয়ে ওঠে অসহায় মাটির টুকরো; ওই বুলডজারের নিচে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাওয়াই হয় নাগরিকের নিয়তি। আমাদের এখানে হচ্ছে তাই। সকলের পক্ষে আইনের সাহায্য নেয়া অসম্ভব এখানে; আইন আমাদের দেশে অত্যন্ত দামি বস্তু, সকলের পক্ষে আইন কেনা সম্ভব নয়। আর আইনের ওপরও বিশ্বাস রাখা শক্ত এ- অঞ্চলে; টাকা থাকলে বিচারও কেনা যায়। রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকদের অধিকার আর স্বাধীনতা হরণ করার জন্যে সব সময় পাগল, সেখানে নাগরিকদের অধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা করবে কে? নিজেদের অধিকার, স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে নিজেদেরই। প্রতিটি নাগরিককে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। পুলিশ দেখলেই ভয় না পাওয়ার অভ্যাস করা দরকার। প্রতিটি নাগরিককে, সে যতো গরিবই হোক না-কেনো, মনে রাখতে হবে যে পুলিশ প্রভু নয়; জনগণের কর্মচারী মাত্র। একা রাষ্ট্রের পীড়নযন্ত্রকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব হ'তে পারে; তাই জনগণকে হওয়া দরকার সংঘবদ্ধ। ব্যক্তির পর রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

স্বৈরাচারীরা যেমন নাগরিকদের অধিকার– স্বাধীনতা হরণ করে, তেমনি হরণ করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অধিকার-স্বাধীনতা; আর প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরাও নিজেদের সুবিধার জন্যে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অধিকার-স্বাধীনতা সমর্পণ করে স্বৈরাচারীদের পদতলে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই হয়ে ওঠে একদিকে দাস অন্যদিকে স্বৈরাচারী। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের স্বাধীনতা-অধিকার রক্ষা করে রক্ষা করতে পারে জনগণের স্বাধীনতা-অধিকার; তার বদলে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে স্বৈরাচারীদের দাস; এবং নানাভাবে নাগরিকদের অধিকার-স্বাধীনতা হরণ করে। এটা জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের দেশে বড়ো কর্তারা সাধারণত ছোটো কর্তাদের প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো অন্যায় আদেশ দিয়ে থাকে, অধিকাংশ সময়ই তা লিখিতভাবে দেয় না, গায়ের জোরে আদেশ দেয়; অসহায় ছোটোকর্তারা তা বিনীতভাবে পালন করে। ছোটোকর্তাটি যদি তা পালন করতে অস্বীকার করতো, তাহলে প্রথমে হয়তো সে মুশকিলে পড়তো, কিন্তু সে ফিরে পেতো অধিকার। একটি উদাহরণ দিই। এক উপাচার্য একবার একটি অত্যন্ত অন্যায় আদেশ দিলেন; অন্যায়টি দেখিয়ে দিলেন একজন বেশ নিম্ন কর্মচারী। তিনি না দেখালে অন্যায়টিই বাস্তবায়িত হতো; – অন্যায় করতে না পেরে উপাচার্য ক্ষিপ্ত হলেন, কিন্তু দমে গেলেন। এভাবেই রক্ষা করা উচিত নিজের অধিকার। প্রতিরোধের মুখোমুখি না হ'লে অন্যায়কারীর অন্যায়প্রবণতা বাড়ে। আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ওপর থেকে চাপানো অন্যায়ে বিপন্ন; তাই বিপন্ন জনগণ।

জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সমাজ সবচেয়ে বেশি শক্তি ও নৈতিক অধিকার অর্পণ করেছে যে-প্রতিষ্ঠানটির ওপর, সেটি বিচারবিভাগ। জনগণ তার ওপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা সমস্ত শক্তি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে পালন করা বিচারবিভাগের নৈতিক কর্তব্য। যে-সমাজের বিচারবিভাগ এ-দায়িত্ব পালন করে না বা পালন করতে পারে না, সে-সমাজের মানুষ অসহায়; তার বিচারবিভাগ নীতিভ্রষ্ট। তৃতীয় বিশ্বের বিচারবিভাগ সাধারণত স্বৈরাচারী শাসকগোত্রের দাস; তা জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা রক্ষা না ক'রে শাসকগোত্রকে সাহায্য করে জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা অপহরণে। ওই বিভাগ বাতাসের প্রবাহ দেখেও অনেক সময় কাজ করে। সামরিক শাসন প্রবর্তনের সময় বারবার দেখা গেছে বিচারবিভাগের প্রধানেরা নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন না ক'রে করেছেন চরম অনৈতিক কাজ; আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির হাস্যকর দেশদ্রোহী দায়িত্ব। তাঁরা কলঙ্কিত করেছেন বিচারবিভাগকে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন জনগণের সাথে। তাঁদের উচিত ছিলো সামরিক আইন প্রতিরোধ করা; তার বদলে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন সামরিক আইনের পায়ে। তাঁদের এ-কলঙ্ক মোচন হ'তে অনেক দশক লাগবে। তাঁদের রায়ও অনেক সময় রচিত হয় প্রভুদের মুখের দিকে তাকিয়ে। দুটি উদাহরণ দেয়া যাক। স্বৈরাচারী জিয়াউল হকের বিনাশের পর পাকিস্তানি বিচারবিভাগ একটি রায় দেয় যার ফলে পাকিস্তানে অস্থায়ী গণতন্ত্র দেখা দেয়; কিন্তু জিয়া বেঁচে থাকলে রায়টি হতো সম্পূর্ণ উল্টো। বছর দুয়েক আগে ঢাকার একটি নিম্ন বিচারালয় একটি অদ্ভুত রায় দেয়। সৌদি এক নাগরিক জুতোর ভেতরে

www.BDeBooks.Com

শেলাই ক'রে কয়েক হাজার ডলার এনেছিলো, যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তাকে যথারীতি গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাকে কয়েক দিন পরেই মুক্তি দেয়া হয়, বোঝা যায় যে বিশেষ চাপে এটা ঘটে। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিতে গিয়ে যে রায়টি দেয়া হয়, তা বিচারকে হাস্যকর ক'রে তোলে। বলা হয়, সৌদি নাগরিক জানতো না যে বাঙলাদেশে জুতোর ভেতর ডলার শেলাই ক'রে আনা অপরাধ! জুতোর ভেতর ডলার শেলাই ক'রে আনা কোন দেশের কোন কালে সাধুতা বলে গণ্য? বিচার বিভাগের এমন চাপে—পড়া রায়ের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যার ওপর অর্পণ করেছি আমাদের সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ভার, যা আমাদের নৈতিকতার প্রহরী, তাই যদি এমন আচরণ ক'রে, তাহলে জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা প্রতিদিন পিষ্ট হবেই কর্কশ স্বৈরজুতোর নিচে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দরকার; বিচারের ভার যাদের ওপর তাদের থাকা দরকার জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা ও নৈতিকতায় গভীর বিশ্বাস, যা থেকে দরকার জনগণের অধিকার-স্বাধীনতা ও নৈতিকতায় গভীর বিশ্বাস, যা থেকে কোনো মোহ বা ভীতি তাঁদের টলাতে পারবে না। ভীতি এখানে রয়েছে; তবে বেশি রয়েছে মোহ। অনেকে রাজনীতিক চাকুরির দিকে চোখ রাখেন। বিচারের নিরপেক্ষতার জন্যেই বিধিপ্রণীত হওয়া উচিত যে অবসরের পরেও বিচারপতিরা বিচার ছাড়া আর কোনো পেশায় যোগ দিতে পারবেন না, রাজনীতিও করতে পারবেন না; এমনকি কোথাও সভাপতি-প্রধান অতিথিও হ'তে পারবেন না। নির্মোহ ও নির্ভয় না হ'লে নিরপেক্ষ বিচার অসম্ভব। সম্প্রতি উচ্চ বিচারালয়ের দুটি রায় আমাদের নিরাশ মনে আশা জাগিয়ে তুলেছে। এ - প্রতিষ্ঠানটিই পারে নাগরিকদের ফিরিয়ে দিতে তাদের হারানো অধিকার-স্বাধীনতা। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিচারবিভাগই সবচেয়ে শক্তিশালী; সমাজ দিয়েছে তাকে সে-শক্তি ও নৈতিকতা। আমরা সব সময় তার শীর্ষ উন্নত দেখতে চাই; তার শীর্ষ হবে বাঙলার সমস্ত মানুষের অধিকার-স্বাধীনতা ও স্বপ্নের সমান উন্নত।

ধনীরা সবাই কারাদণ্ডের উপযুক্ত

ধন যে দস্যুতা এটা আমাদের ধনীরা যেভাবে প্রমাণ করেছে, তা সম্ভবত আর কেউ পারে নি। দস্যুতার চারটি পর্ব তারা পেয়েছে, আর পুরোপুরি তার সদ্ব্যবহার করেছে। প্রথমটি পাকিস্তান পর্ব; সেটা ছিলো মুসলিম লিগিদের কালোবাজারি, চোরাচালানি, ঘুষ আর লুটপাটের কাল। পাকিস্তানের প্রথম পর্বের সাহিত্যে কালোবাজারি আর চোরাচালানির বিশ্বস্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। যারা চোরাচালানি আর কালোবাজারির মতো ঝুঁকিপূর্ণ ধনোৎপাদনে লিপ্ত ছিলো, তারা ছিলো মুসলিম লিগের নিচের দিকের নেতা আর মাস্তান। ওপরের দিকের নেতারা খেতো ঝুঁকিহীন ঘুষ; লুট করতো জনগণের সম্পত্তি। এসব করতো তারা আইনসম্মতভাবেই। কোনো আইন ক'রে তারা জমির মালিক হতো, কোনো নিয়মে তারা হতো শিল্পপতি। সরকারি কর্মচারীদের জন্যে ঘুষ সব সময়ই ধনী হওয়ার রাস্তা। তারা বিরামহীনভাবে ঘুষ খেয়ে আসছে। পিয়ন থেকে সচিব, সবারই প্রিয় খাদ্য ঘুষ; আর মন্ত্রী হওয়ার ওই একটাই তো উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার পর এসেছে দস্যুতার তিনটি পর্ব। প্রথমটি আওয়ামি লিগি পর্ব। এদের পূর্বপুরুষদের যদি দস্যু বলি, তবে এদের চোর বললেই ধারণাটি ঠিকমতো প্রকাশ পায়। দস্যুতার মধ্যে যে মহিমা রয়েছে, তা নেই চোরামিতে; চোরের কোনো বাছবিচার নেই, ছিলো না আওয়ামি লিগিদেরও। তারা চুরি করেছে, ঘুষ খেয়েছে, লুটপাট করেছে, চোরাচালানি আর কালোবাজারি করেছে। এরপর আসে চৌর্যবৃত্তির দুটি পর্ব; আসলে একই পর্ব, দু-ভাগে বিভক্ত। দুটিই সামরিকি বা জেনারেলি পর্ব, যদিও গণতান্ত্রিকভাবে পর্ব দুটিকে জাতীয়তাবাদী ও জাতীয় দলি পর্ব নাম দেয়া যায়। এ-সময়ে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই ঘুষ, চোরাচালানি, কালোবাজারি, লুটপাটের একশেষ ক'রে, ছাড়ে–সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তারা কারখানা লুটপাট করে, ব্যাংক লুটপাট করে, ঘুষকে অলিখিত রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করে। সরকারি কর্মচারীদের জন্যেও এ-সময়টা হয়ে ওঠে সোনালি কাল। এখন-এ-দেশে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যার বেশ কিছু টাকা আছে, অথচ সে কোনো দুর্নীতিতে জড়িত হয় নি। দুর্নীতি ছাড়া এখানে ধন অসম্ভব। কোটি কোটি টাকা হয়েছে অনেকের; ওই টাকা সৎপথে হয়নি, হয়েছে দুর্নীতির কালো পথে। বড়ো ধনীরা সরকারি সহযোগিতায় লুট করেছে ব্যাংক; – তারা ধার নিয়েছে, ফেরত দেয় নি; কারণ ফেরত চাওয়ার মতো অবস্থা রাষ্ট্রচালকের নয়। ওই ধারের বড়ো টাকা অংশ তারা পেয়েছে। কলকারখানা, ব্যাংক ও আরো কতো কী ছেড়ে দেয়া হয়েছে ব্যক্তি মালিকানায়; এমনি ছেড়ে দেয়া হয় নি, কালো টাকায় অনেকে ফেঁপে উঠেছে। কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন লুট করছে দেশের কয়েক শো

www.BDeBooks.Com

শক্তিমান। দেশে শেষ নেই ঘুষ আর চোরাচালানির। পিয়ন ঘুষ খাচ্ছে, কেরানি ঘুষ খাচ্ছে; কর্মকর্তা খাচ্ছে, পরিচালক খাচ্ছে, মহাপরিচালক ঘুষ খাচ্ছে; ব্যবস্থাপক খাচ্ছে, কোষাধ্যক্ষ খাচ্ছে; পুলিশ খাচ্ছে; দারোগা খাচ্ছে, তাদের কর্তারা খাচ্ছে; সবাই ঘুষ খাচ্ছে। ঘুষই হয়ে উঠেছে গরম ভাত। ঢাকা শহরে যতো বাড়ি আছে তার প্রায় প্রতিটি অসৎ অর্থের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের প্রতিটি সচ্ছল মানুষ অপরাধী। সারা দেশ জুড়ে যে-উন্নয়ন চলছে, সেটা প্রধানত অপরাধের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। যে-লোকটি চমৎকার গাড়ি থেকে নামলো, দেখতে যাকে দেবদূত মনে হচ্ছে, সে নিশ্চিতভাবে অপরাধী; হয়তো সে এখনই বড়ো দাগের একটা ঘুষ খেয়ে এলো। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে ব'সে আছে সুবেশ ভদ্রলোক, নানা টেলিফোনে কথা বলছে দেশেবিদেশে; সে নিশ্চিতভাবে অপরাধী। হয়তো এ-মুহূর্তেই টেলিফোনে সে মারাত্মক একটা অপরাধের পরিকল্পনা করলো। টেলিভিশনে ফিতে কাটতে দেখা যাচ্ছে এক শক্তিমানকে; কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে অপরাধী; ফিতে কেটে সে যা উদ্বোধন করছে, হয়তো তা থেকেই তার কোষে কোটি টাকা ঢুকেছে। ধর্মগ্রহ থেকে বেরোচ্ছে ধনী ধার্মিক, মুখে সুন্দর স্বর্গীয় ভাব লেগে আছে; অন্যমনস্কভাবে গাড়িতে উঠলো ধার্মিক (আজকাল গাড়িচরা ধার্মিকের সংখ্যা খুব বেড়েছে), মনে হচ্ছে যেনো বেহেশতের উদ্দেশেই যাত্রা করলো; কিন্তু যাবে হয়তো বিমানবন্দরে সোনা চোরাচালানে। কী সুন্দর অপরাধীরা আমাদের চারপাশে!

অপরাধীদের শনাক্ত করার ও শাস্তি দেয়ার একটা রীতি সভ্যমণ্ডলে রয়েছে; কিন্তু বাঙলায় তা স্বাভাবিক নয়। অপরাধীরা এখানে সাধারণত শাস্তি পায় না, তারাই সাধারণত অন্যদের অধিকাংশ সময় নিরপরাধদের-শাস্তি দিয়ে থাকে। অপরাধ সম্পর্কেও আমাদের, বিশেষ ক'রে রাষ্ট্রের, ধারণা পরিচ্ছন্ন নয়। অধিকাংশ আর্থিক অপরাধ সম্পন্ন হয়ে থাকে রাষ্ট্রিক উৎসাহে; তাতে জড়িত থাকে তারা, যারা চালায় রাষ্ট্রযন্ত্রটি। ব্যাংক থেকে কোটি টাকা ঋণ নিয়ে যে ফেরত দেয় না, সে অপরাধী; তবে বড়ো অপরাধী তারা, জনগণ যাদের ওই টাকা ফেরত নেয়ার দায়িত্বে রেখেছে। ফেরত না নেয়া ও না দেয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অপরাধীরা। জনগণের সম্পত্তিকে এখনো আমরা বলি সরকারি সম্পত্তি, যেনো সরকার নামে একটা জমিদার রয়েছে, যে সব কিছুর মালিক। রাষ্ট্রের প্রতিটি মুদ্রার মালিক জনগণ; সরকার দায়িত্ব পেয়েছে, আমাদের দেশে জোর ক'রে দায়িত্ব দখল করেছে, জনগণের প্রতিটি মুদ্রা দেখাশোনা করার। কিন্তু তারা দেখাশোনার দায়িত্ব নেয় নি, নিয়েছে লুঠতরাজের অধিকার। জনগণের সম্পত্তি যারা লুটপাট ক'রে, তারা খুনিদের থেকেও বেশি অপরাধী। তাই তাদের প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড; অন্তত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তাদের প্রাপ্য। এ-দেশের অধিকাংশ মানুষ রাস্তার পশুর জীবন যাপন করে, কারণ তাদের ধন অপহরণ করে নানা ধরনের শক্তিমানেরা। তাদের ধন যদি গুলশানের, বনানীর, ধানমণ্ডির, বেইলি রোডের, উত্তর ও আরো অজস্র পাড়ার অপরাধীরা লুটপাট না করতো, তাহলে তাদের পথের পশুর জীবন যাপন করতে হতো না। খুন করা অপরাধ; আর যারা দেশের অধিকাংশ মানুষকে মানুষের জীবনই যাপন করতে দেয় না, তারা যে-অপরাধ করে, তা খুনের থেকেও বড়ো অপরাধ। যাদের বেশ কিছু টাকা আছে, তারা কোনো-না-কোনো অপরাধ ক'রেই

ওই টাকা আয়ত্ত করেছে। এ-গরিব দেশে সৎ পথে বেশি টাকা করার উপায় নেই। তাই আমাদের ধনীরা সবাই অপরাধী; অধিকাংশই গুরুতর অপরাধী; এবং তারা সবাই দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত। মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্তও অনেকেই। এ-বিচারের জন্যে কোনো বিচারালয়ে যাওয়ার দরকার পড়ে না; জনগণের বিচারে তারা সবাই এভাবেই দণ্ডিত। ওই সুবেশ ভদ্রলোক ব'সে আছে টাওয়ারের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে, সে অপরাধী, যেমন অপরাধী একটি দণ্ডিত দুর্বৃত্ত; ওই কোটিপতি বিমানের বিলাসশ্রেণীতে ভ্রমণে যাচ্ছে, সে অপরাধী, যেমন অপরাধী একটি দণ্ডিত দস্যু; ওই শিল্পপতি দামি গাড়িতে যাচ্ছে, সে অপরাধী, যেমন অপরাধী কোনো দণ্ডিত সমাজবিরোধী; ওই যে শক্তিমান টেলিভিশনে রঙিন হয়ে আছে, সে অপরাধী, যেমন অপরাধী দণ্ডিত ঘাতক। কিন্তু এরা কেউ দণ্ডিত নয়, এরাই সমাজের প্রভু; এরাই দণ্ডদাতা। আমাদের সাধারণ জগত অধিকার ক'রে আছে অপরাধ জগতের প্রভুরা, যাদের শাস্তি প্রাপ্য, তারা আছে শক্তিতে সম্মানে; এটাই আমাদের সমাজের বড়ো অসুখ। দণ্ড যাদের প্রাপ্য, তাদের মুক্ত রেখে কোনো সমাজ সুস্থ থাকতে পারে না।

www.BDeBooks.Com

ইসলামি বিশ্ব : অন্ধকার এলাকা

পৃথিবীটা যে খুব আলোকিত এমন নয়; এর চারদিকেই অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে জমে আছে। অনেক অন্ধকার কেটে এগোচ্ছে মানুষ ও তার পৃথিবী, অনেক সাধনায় অর্জন করেছে ছিটেফোঁটা আলো; তবে ওই সামান্য আলোর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। দশ দিগন্ত থেকে আলো মুছে দেয়ার জন্যে রাহুদের রোমশ হাতগুলো সব সময়ই বিস্তৃত হয়ে আছে পৃথিবীর দিকে দিকে। অনেক শতাব্দী ধ'রে পথ চলছে, তবু আজো বেশি দেখে নি আর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনীতিক আলো। পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষের জীবনই কীটপতঙ্গের জীবন; তাদের খাদ্য জোটে না, সামাজিকভাবে তারা লাঞ্ছিত, তাদের নেই কোনো রাজনীতিক অধিকার। জীবন তাদের কাছে একটা হিংস্র দুঃস্বপ্ন। সমাজতন্ত্র এখন দুরাশায় পরিণত হয়ে গেছে; তাই গণতন্ত্রের কথাই ধরি, যদিও গণতন্ত্র পাওয়া খুব বড়ো পাওয়া নয়। ওই গণতন্ত্রই নেই অধিকাংশ দেশে। পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য ক'রে চলছে একনায়কেরা; তাদের বুটের নিচে প'ড়ে আছে অসহায় মানুষেরা। গণতন্ত্র এমন একটি সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থা, যা আয়ত্ত করার অর্থ হচ্ছে কিছুটা আলো আয়ত্ত করা। রাজা মনুষ্যত্বের অপমান, একনায়ক সব রকম শুভময়তার শত্রু। মনুষ্যত্ব হচ্ছে মানুষের অপমান থেকে সম্মানে পৌঁছা; সমস্ত অশুভকে পরাজিত ক'রে শুভময়তা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু এটাই হচ্ছে না পৃথিবী জুড়ে। এশিয়া অন্ধকার, আফ্রিকা অন্ধকার, দক্ষিণ আমেরিকা অন্ধকার; ইউরোপেও নানা দিকে অন্ধকার। তবে সবচেয়ে বেশি অন্ধকার সম্ভবত ঘনীভূত হয়ে আছে ইসলামি বিশ্বে। এর পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে কোথাও আলো নেই, কোথাও গণতন্ত্র নেই, কোথাও অধিকার নেই মানুষের। এর কোথাও রাজা, কোথাও আমির, কোথাও একনায়ক; এদের অধিকাংশই জনগণের প্রতিনিধি নয়, প্রায় সবাই মানুষের শত্রু। এরা মানুষকে কোনো অধিকার দেয় না; মানুষকে পীড়ন করে অস্ত্র ও শাস্ত্র দিয়ে, নিজেরা ভোগ করে অবাধ স্বৈরাচারী স্বাধীনতা। তারা সবাই অমিতাচারে অভ্যস্ত, ধর্মের কোনো বিধিনিষেধ তারা আন্তরিকভাবে মান্য করে না; কিন্তু জনগণকে আটকে রাখে ধর্মের শেকলে, সন্ত্রস্ত ক'রে রাখে অস্ত্র দিয়ে। সারা ইসলামি বিশ্ব জুড়ে তারা পেতে আছে অন্ধকারের রাজত্ব। দু-এক দশক আগেও আর্থনীতিকভাবে এটাই ছিলো সবচেয়ে অবিকশিত এলাকা; এখনো এর অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীর দরিদ্রতমদের মধ্যে পড়ে, যদিও কয়েকটি দেশ আকস্মিকভাবে ধনভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা এক বড়ো পরিহাস যে ইসলামি বিশ্বের ধনভারাক্রান্ত দেশগুলোই বেশি অবিকশিত সামাজিক রাজনীতিকভাবে। তারা ওই ধন সৃষ্টি করে নি, কোনো কিছুই সৃষ্টি বা উৎপাদন করে নি

তারা; দৈব সম্পদে তারা ধনী হয়েছে, আর ওই সম্পদকে ধনে পরিণত করতেও তাদের সাহায্য করেছে অন্যরা। তারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করে নি, বরং তার বিরুদ্ধে তারা সব সময়ই কাজ ক'রে চলছে। তারা জনগণকে রাজনীতিক অধিকার দেয় নি; মানুষকে মুক্ত করে নি মধ্যযুগ থেকে; নারীদের আজো ক'রে রেখেছে সম্ভোগের সামগ্রী। অন্ধকারের এলাকায় যা-কিছু ঘটতে পারে, তারা তার সব কিছুই, একটু বেশি করেই, ঘটিয়ে চলছে অবিরাম। তারা প্রকাশ্যে চাবুক মারছে, শাসকদের কখনো একলা কখনো সপরিবারে খুন করছে, কখনো ফাঁসিতে ঝুলোচ্ছে, কখনো এক দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ছে আরেক দেশের ওপর; কখনো দেশের সেনাবাহিনী দখল করছে দেশ; কখনো মেতে উঠছে গণহত্যায়। আধুনিক বিশ্বের আলো এখানে নিষিদ্ধ, এখানে আঁধারের একাধিপত্য। রাজনীতিকভাবে অবিকশিত রয়ে গেছে এ-বিশ্ব, আর যা রাজনীতিকভাবে অবিকশিত তা থাকে সামগ্রিকভাবেই অবিকশিত। ইসলামি বিশ্বকে যারা অধিকার ক'রে আছে, তারা নিজেদের ও পুঁজিবাদী বিশ্বের স্বার্থে অবিকশিত রাখছে ইসলামি বিশ্বকে। এ-বিশ্বের সাধারণ মানুষেরা বিকাশের পক্ষে; তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে চলছে, কিন্তু অন্ধকার এতোই শক্তিশালী যে আলো প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ব্যর্থ হচ্ছে বারবার।

পরপর দুটি ঘটনা ঘটেছে অন্ধকার এলাকায়, দুটিই চরিত্রে এক, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা দুটিকে বিভিন্ন ব'লে মনে হ'তে পারে। দুটিই সমান হিংস্র ও ভয়াবহ, যদিও অনেকের কাছে একটিকে বেশি ভয়াবহ মনে হ'তে পারে অন্যটির থেকে। তবে যেটিকে কম ভয়াবহ ব'লে মনে হবে অনেকের, আসলে সেটিই বেশি মারাত্মক। ইরাক কুয়েত দখল করেছে, খুনখারাবি করছে, এটা অবশ্যই আতঙ্কজনক; তবে এর চেয়ে বেশি আতঙ্কজনক পাকিস্তানের ঘটনা, যেখানে অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আক্রমণ করেছে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে; অর্থাৎ নিজের দেশকে। বিদেশি শত্রুর আগ্রাসনের থেকে দেশি শত্রুর আগ্রাসন অনেক বেশি ভয়াবহ, বিশেষ ক'রে দেশটি যখন পাকিস্তান, যেখানে রয়েছে এমন আগ্রাসনের চমৎকার ইতিহাস। পাকিস্তানের আমলা ও অনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সেখানকার সেনাপ্রভুদেরই প্রতিনিধি। তার আক্রমণ গণতন্ত্রের ওপর সেনাপতিদেরই আক্রমণ, যারা আর কিছুদিন পর বুট প'রে সশরীরেই সিংহাসনে বসবে। ওই তরুণীটিকে যে তারা বিশ মাস ক্ষমতা ভোগ করতে দিয়েছে, এটা তাদের অসহায় কৃপা; তবে তারা কখনো ওই তরুণীর অধীনে বাস করে নি। তারাই আসলে শাসন করেছে পাকিস্তান, ওই তারুণীটিকে তারা রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনেত্রীর ভূমিকায়। তরুণীটিকে তারা আপাতত ছেড়ে দিয়েছে, তবে তাকে যে ছেড়ে দেবে, এটা ভাবা হাস্যকর। তার বাবাকে তারা দড়িতে ঝুলিয়ে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র শিখিয়েছে, তাকেও যে দড়িতে ঝুলিয়ে গণতন্ত্র শেখাবে না, অন্ধকার বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাধ মেটাবে না, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী বর্বরতম শিক্ষক, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরম শিক্ষা না দিয়ে সে কখনো সুখ পায় না। ওই তরুণীর নিয়তি হয়তো ঘনিয়ে এসেছে, এটা বেদনায়ক; তবে আরো শোচনীয় হচ্ছে যে পাকিস্তানে নিয়তি ঘনিয়ে এসেছে আলোকের, এবং পাকিস্তানেরই।

www.BDeBooks.Com

এটা কি ইরাকের কুয়েত আক্রমণ ও অধিকারের থেকে বেশি ভয়াবহ নয়? ইরাকে চলছে এখন নৃশংসতম স্বৈরাচার; আর আরব এলাকার সব দেশের অবস্থাই একই রকম। ইরানে এক দশক ধ'রে এক অন্ধকারের বদলে আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে আরেক অন্ধকার। যে-কুয়েত আক্রান্ত হয়েছে, তার অবস্থাও যে ভালো ছিলো, সেখানে যে আলো ছিলো, এমন নয়। বংশানুক্রমিক পারিবারিক শাসন চলছিলো সেখানে; মানুষের কোনো রাজনীতিক অধিকার ছিলো না। তবে তারা হয়তো ভোগ করছিলো স্বাধীনতাহীন স্বাধীনতা; ইরাক তাও হরণ করেছে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র যে-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও উপভোগ্য; প্রতিবাদ করতেও যেনো তারা ভয় পাচ্ছে, বা সবারই মনে পড়ছে নিজেদের চরিত্র। ওই এলাকায় যদি আলো থাকতো, তাহলে প্রতিক্রিয়া হতো অন্যরকম। একটি ইসলামি বিশ্বযুদ্ধ কি বেধে যাবে কুয়েত-ইরাককে নিয়ে? এটা নির্ভর করছে আমেরিকার উৎসাহের ওপর; নইলে কুয়েত ইরাকেরই একটি তেলখনিতে পরিণত হবে। আমেরিকা আরব ভূভাগের প্রহরী; আমেরিকার ওপরই নির্ভর ক'রে টিকে আছে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণবিচ্ছিন্ন শাসকেরা। যদি বড়ো ধরনের কোনো যুদ্ধ বাধে, তাহলে বড়ো রকমের ওলোটপালোট হ'তে পারে; এমনকি ইসলামি বিশ্বের অন্ধকারও কেটে যেতে পারে অনেকটা। ভেঙে পড়তে পারে অনেক রাজাধিরাজ রাজপরিবার, বিদায় নিতে পারে প্রমোদপরায়ণ আমির ও একনায়কেরা। কুয়েতের মানুষেরা হয়তো ফিরে পাবে স্বাধীনতা, ফিরে পেতেই হবে; তবে তারা যদি আবার আগের আমিরবংশেরই প্রজা হয়, তাহলে অন্ধকার কাটবে না। বেশ বড়ো একটা ওলোটপালোট দরকার ইসলামি বিশ্বে, দরকার একটা প্রচণ্ড সামাজিক-রাজনীতিক ভূমিকম্প, যাতে ওই এলাকার পাথরের মতো জমাট অন্ধকার ভেঙেচুরে ঢোকে আলোকের ঝরনাধারা।

মরুভূমিতে বাঙালির লাশ

আমি দেখতে পাচ্ছি মরুভূমির বালুকার ওপর একটি নামপরিচয়হীন লাশ প'ড়ে আছে। বাঙালির। সে বাঙলার কোনো নদীতীর থেকে গিয়েছিলো মরুভূমিতে। দেখতে পাচ্ছি মরুভূমির বালুকার ওপর প'ড়ে আছে আরেকটি লাশ। বাঙালির। সে বাঙলার কোনো লাউলতা ঘেরা কুঁড়েঘর থেকে গিয়েছিলো মরুভূমিতে। দেখতে পাচ্ছি মরুভূমির ওপর পড়ে আছে তিনটি, চারটি, পাঁচটি – অসংখ্য অগণন বাঙালির লাশ। তারা বাঙলার কোনো সবুজ গরিব গ্রাম থেকে, ধানখেতের পাশ থেকে, পুকুরের পাড় থেকে, কালো মেঘের ছায়া থেকে, অভাবের কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে গিয়েছিলো মরুভূমিতে। বুকে তাদের কোনো বড়ো স্বপ্ন ছিলো না, চোখে ছিলো শুধু কিছু মুদ্রার ছবি। তারা কোটি কোটি টাকার বড়ো স্বপ্ন দেখেনি, কল্পনায় ছবি দেখেছিলো মাত্র কয়েক লাখ টাকার। তারা জানতো তারা স্বর্গে যাচ্ছে না, এমনকি ইউরোপ আমেরিকা জাপানে যাচ্ছে না; জানতো তারা যাচ্ছে মরুভূমিতে, যেখানে জীবন দোজখের মতোই নির্দয়। তবু তারা সেখানে গিয়েছিলো শুধু কয়েক মুঠো মুদ্রার জন্যে। আজ তাদের কেউ লাশ হয়ে পড়ে আছে মরুভূমির দুঃস্বপ্নগ্রস্ত শহরের কোনো রাস্তার ওপর, কেউ তাকে কোনো কবরে সমাহিত করবে না। যদিও তারা গিয়েছিলো তাদের তীর্থের কাছাকাছি, তবু তাদের লাশের পাশে কোনো ধর্মীয় শ্লোক উচ্চারিত হবে না। নামগোত্রহীন করুণ বাঙালির লাশ প'ড়ে আছে তুরস্কের সীমান্তের বালুকাস্তূপের তলদেশে। মরুভূমির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না, মরুভূমি তাদের কল্পনার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত; তবু তাদের পরিসমাপ্তি ঘটলো নির্মম মরুভূমিতে। একে নিয়তির নির্মম পরিহাস ব'লেই মনে হয়; তবে এ নিয়তি অলৌকিক নয়, অত্যন্ত লৌকিক। তারা সবাই পালাতে চেয়েছিলো, বাঁচতে চেয়েছিলো পালিয়ে; কিন্তু পালাতে পারে নি। এর আগেও একবার পালাতে হয়েছিলো তাদের, তবে সেটা মরুভূমিতে নয়, মাতৃভূমিতে–বাঙলায়-সেবারও সবাই পালাতে পারে নি। সেবার তারা জানতো কোথায় যাচ্ছে তারা, কোন পথে যাচ্ছে তারা, জানতো পথে পথে দেখবে তারা বাঙালিরই মুখ। একাত্তরে তারা নিজেদের দেশেই পালিয়েছিলো নিজেদের গৃহ ছেড়ে স্থায়ী গৃহের উদ্দেশ্যে। সেবার তাদের যারা তাড়া করেছিলো তাদের মুখও বাঙালির মুখ ছিলো না, ছিলো মরুভূমির মুখ; এবারও তাদের তাড়া করেছে মরুভূমির বিকট মুখ। সেবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো দেশদ্রোহিতার, স্বাধীনতা ঘোষণার; এবারও তারা জড়িয়ে পড়েছে তেমনি একটি ব্যাপারে, যদিও এতে কোনো ভূমিকা নেই তাদের। তারা সেখানে যে-জীবনযাপন করেছে, তাতে কোনো জীবন ছিল না; দাসের জীবনই তারা যাপন করেছে সেখানে;–

www.BDeBooks.Com

আদেশ মেনেছে, আর শুধু কাজ করেছে কিছু টাকার জন্যে। সেখানে তাদের শারীরিক মানসিক কোনো কামনাই পরিতৃপ্ত হয় নি; জীবনকে তারা চেপে রেখেছিলো সেখানে; ভেবেছিলো একদিন দেশে ফিরে এসে জীবনে ফিরে আসবে। কিন্তু জীবনে ফিরে আসার সমস্ত স্বপ্ন তাদের লুপ্ত হয়েছে মরুভূমির হিংস্র বালুকাস্তূপের নিচে। বাঙলার কোনো নিবিড় গ্রাম চাপা পড়েছে কুয়েতের বালুকার নিচে, বাঙলার কোনো নড়োবড়ো কুঁড়েঘরের প্রাণ পিষ্ট হয়েছে জর্দানের বালিয়াড়ির নিচে, সৌদি আরবের বালুকাঝড়ে নিভে গেছে বাঙলার কোনো কুটিরের প্রদীপ, তুরস্কের সীমান্তে শুকিয়েছে বাঙলার কোনো বিলের শাপলা, তার খবর কোনোদিন কেউ জানবে না। তারা সবাই ছুটেছিলো তাদের ছোটো দেশ আর গৃহের উদ্দেশে, কিন্তু তারা বালুর আদিগন্ত ঢেউয়ের নিচে চিরকালের জন্যে চাপা প'ড়ে গেছে। মায়ের বিলাপ সেখানে শোনা যাবে না, বোনের অশ্রু পড়বে না ক্রুদ্ধ মরুভূমির ওপর; তারা মরুভূমিতে মিশে যাবে। তাদের জন্যে বাঙলায় মায়ের বুকে জন্ম নেবে মরুভূমি, বোনের চোখে খাঁখাঁ করবে সাহারা, পিতার হৃদপিণ্ডে বয়ে যাবে প্রচণ্ড বালুকাঝড়; তাদের জন্যে দয়িতার জীবন হয়ে উঠবে মরুভূমি, সন্তানের অশ্রুতে জ্ব'লে উঠবে মরুর আগুন। আমি দেখতে পাই মরুভূমির নির্মম বালুকার ওপর নির্দয় আকাশের নিচে লাশ প'ড়ে আছে– বাঙালির। হিংস্র বালুকায় ঢাকা পড়ছে বাঙালির লাশ।

যারা লাশ হয়নি, যারা এখনো ছুটছে মরুভূমির ওপর দিয়ে, যারা উদ্বাস্তু হয়ে ভিড় করছে তুরস্কের সীমান্তে, যারা নিরাশ্রয় প'ড়ে আছে নানা আরব দেশে, আর যারা নিঃস্ব ফিরে এসেছে বাঙলায়, তাদের অবস্থা লাশের চেয়ে ভালো এ-অর্থে যে তারা বেঁচে আছে। বেঁচে থাকাও অনেক সময় মৃত্যুর থেকে মর্মান্তিক হয়; তারা এখন রয়েছে তাদের জীবনের মর্মান্তিক পর্বে। মরুভূমি থেকে সবাই ফিরে আসতে পারবে না; আরো অনেকে হারিয়ে যাবে। যারা ফিরে এসেছে ও আসবে, তাদের অবস্থা? তারা কেউ রাজপুত্র ছিলো না, তারা কেউ প্রমোদভ্রমণে যায় নি ওই আততায়ী মরুভূমিতে, আর তাদের যাওয়ার পথেও গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো ছিলো না। অনেক কষ্টে তাদের একটা কাজ পেতে হয়েছে, অনেক প্রতারণা পোহাতে হয়েছে তাদের, হয়তো ভিটেমাটি বেচে দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে হয়েছে নরব্যবসায়ীদের, এবং যেতে পেরেছে মরুভূমিতে। তারা সেখানে সম্মান পায়নি, চায়ও নি; তারা কিছু টাকা চেয়েছিলো, তা আয় করতে রাজি হয়েছিলো নিজের গরম ঘামের বিনিময়ে। যারা মরুভূমিতে গিয়েছিলো তারা হয়তো কয়েকটি টাকার মুখ দেখেছিলো, বা দেখার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তাদের জীবনে; কিন্তু ওই পাপিষ্ঠ টাকাই অভাবিত সংকট নিয়ে এসেছিলো তাদের জীবনে। পথেপথে তারা প্রতারিত হয়েছে; এবং চরম প্রতারণা করেছে তাদের মরুভূমি। নরব্যবসায়ীরা তাদের ঠকিয়েছে, এলাকার টাউটেরা শোষণ করেছে, এমনকি প্রতারণা করেছে তাদের ভাই, প্রতারণা করেছে স্ত্রী। তারা পড়েছে সামাজিক ও মানসিক সংকটে। অনেকের মাসের পর মাস পাঠানো টাকা আত্মসাৎ করেছে নিজেরই ভাই, এমনকি জন্মদাতা পিতা; অনেকের স্ত্রী প্রিয়বিরহ সহ্য করতে না পেরে শরীর সমর্পণ করেছে পাড়ার প্রেমিকের আলিঙ্গনে, অনেকের স্ত্রীকে ধর্ষণ ক'রে হত্যা করেছে নিজেরই

সহোদর। এ-সামাজিক মানসিক সংকটে যুক্ত হয়েছে এখন জীবনসংকট। যারা ফিরে এসেছে, তারা ফিরেছে শুধু নিজেদের ক্লান্ত দেহ আর মলিন পুরোনো পোশাক নিয়ে; তাদের সমস্ত ঘামের উৎপাদন তারা রেখে এসেছে মরুভূমিতে। তা কি তারা কোনোদিন ফিরে পাবে, ফিরে পাওয়া পর্যন্ত তারা কি সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে? একদিন তাদের ফিরতেই হতো, কিন্তু এমনভাবে ফেরার কথা ছিলো না। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি আবার কবে সুস্থ হবে, তা কেউ জানে না; তাই তাদের সকলের জীবন মরুভূমির বালুকার সাথে এক ভবিষ্যৎহীন সুতোয় গাঁথা। এখন আবার অন্ধ সরকার শুধু তাদেরই নয়, সমগ্র বাঙালির জীবনকেই গেঁথে দেয়ার উপক্রম করেছে মরুভূমির সাথে। সরকারের যুদ্ধ করার খুব সাধ হয়েছে। তারা কখনো যুদ্ধটুদ্ধ করেনি, দেশসম্ভোগ ক'রে আসছে দু-দশক ধরে; এবার একটু যুদ্ধে যাওয়ার শখ হয়েছে। এ-শখ যে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে, সেটা বোঝার মতো দূরদর্শিতা গণবিরোধীদের নেই। যুদ্ধে পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠানো যা, পাঁচ লাখ পাঠানোও তাই; এর অর্থ হচ্ছে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। সরকারি এ-সিদ্ধান্ত বাঙালিদের অকল্পনীয় দুর্ভোগে ফেলবে। এখন বাঙালি প্রতিদিন মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির কোনো-না-কোনো প্রান্তে প্রাণ হারাচ্ছে, উদ্বাস্তু হয়ে ফিরছে মরুপথে; যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর দেশেই মরুভূমির ঝড় উঠবে। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ; লুঠতরাজ সব সম্পদ নষ্ট ক'রে ফেলেছে মানুষের শত্রুরা। অধিকাংশ বাঙালির জীবনে এখন দুর্দশাই একমাত্র সত্য;— সরকার একে চরম সত্যে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাঙালির লাশ প'ড়ে আছে মরুভূমিতে; — কিছুদিন পর বাঙালির লাশ পড়বে নিজেরই দেশে। সরকার সম্ভবত এখন লাশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে।

www.BDeBooks.Com

ব্যঙ্গচিত্রের স্বাধীনতা

বাঙালির ইতিহাস যুগপৎ স্বাধীনতা পাওয়া ও হারানোর ইতিহাস। একদিকে আমরা যতোটা স্বাধীনতা পাই, একই দিনে আরেক দিকে আমরা তার অনেক বেশি স্বাধীনতা হারাই। এক দশকে আমরা যতোটা রাজনীতিক স্বাধীনতা পাই, অর্থাৎ রক্ত দিয়ে অর্জন করি; এক বছরেই তার কয়েক গুণ চিন্তার ও বাকস্বাধীনতা হারাই। ব্রিটিশপর্বে রাজনীতিকভাবে পরাধীন ছিলাম, কিন্তু চিন্তার ও তা প্রকাশের স্বাধীনতা ছিলো অনেক বেশি। অনেক বিষয়েই তখন সরব চিন্তা করা যেতো, প্রকাশও করা যেতো; কিন্তু পাকিস্থানপর্বে [বাঙলায় নামটি পাকিস্থানই হওয়া উচিত ছিলো, এর পর আমি পাকিস্থানই লিখবো] তা ছিলো অসম্ভব। নজরুল ও বেগম রোকেয়ার কথাই ধরা যাক; তারা সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে এমন অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, যা এখন ভাবতেও ভয় লাগে। এখন সে-সব প্রকাশ শুধু অসম্ভবই নয়, অত্যন্ত ভয়াবহও। পাকিস্থান ও বাঙলাদেশপর্বে কোনো নজরুল বা রোকেয়ার জন্ম সম্ভব ছিলো না, ও অসম্ভব। এখন কোনো নজরুল বা রোকেয়া ওই সব বক্তব্য প্রকাশ করলে তাঁদের রাস্তায় ছিঁড়ে ফেলা হবে। আমরা ভণ্ড বলে মৃত নজরুল-রোকেয়ার কবরে সৌধ তুলি, কিন্তু জীবিত নজরুল রোকেয়ার গলা কাটার জন্যে সবচেয়ে ধারালো ছুরিকাগুলো প্রতিদিন শানিয়ে রাখি। পাকিস্থানপর্বে পুরোপুরি স্বাধীনতা ছিলো না, তবে তখনো ব্যঙ্গ করার ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকার স্বাধীনতা ছিলো, এখন নেই। এখন তা বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। কেননা ব্যঙ্গ করলে শক্তিমানদের মহিমা নষ্ট হয়। তখন পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে বেরোতো ব্যঙ্গচিত্র। সেগুলোর সবই ছিলো রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্র, যাতে ব্যঙ্গ করা হতো আইউব খাঁর মতো একনায়ককে, আর তার পদসেবকদের। কোনো দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতা কতোখানি আছে, তা পরিমাপ করা যায় রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্র দিয়ে; যে-দেশে রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্র নেই, সে-দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতা নেই। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চিত্র রাজনীতিক স্বাধীনতার মানদণ্ড। পশ্চিমে রাজনীতিক স্বাধীনতা রয়েছে, তাই রয়েছে প্রখর রাজনীতিক ব্যঙ্গচিত্র; সে-সব চিত্র কৌতুক পরিবেশন করে, সাথে পেশ করে অসামান্য রাজনীতিক ভাষ্য। বিলেতে রানী আর প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে প্রতিদিন মারাত্মক ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়, এমনকি দূরদর্শনেও ভয়ংকর কৌতুক করা হয়। তাতে তারা ক্ষেপে উঠে পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ ক'রে দেয় না। সভ্যতার সহনশীলতা অসীম, সভ্যতার ক্রোধও অশেষ। উইলি ব্রান্ডটের শাসনের শেষ দিকে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয় একটি পশ্চিম জর্মন সাময়িকীতে;– সময়টা আর্থনীতিকভাবে বেশ খারাপ, হেলিকপটারে চ'ড়ে যাচ্ছে ব্রান্ডট

ও তার স্ত্রী। ব্রান্ডটের করুণাময়ী স্ত্রী নিচের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'আমার যদি দশটি দশ মার্কের নোট থাকতো, তবে আমি সেগুলো নিচে ফেলে দিতাম, সেগুলো পেয়ে অন্তত দশজন জর্মন সুখী হতো।' ব্রান্ডট নিচের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'আহা, আমার যদি মাত্র একটিও দশ মার্কের নোট থাকতো, তবে আমি এখনই সেটি নিচে ফেলে দিতাম; সেটি পেয়ে অন্তত একজন জর্মন সুখী হতো।' তাদের কথা শুনে পাইলট বলছে, 'যদি সম্ভব হতো তবে আমি তোমাদের দুজনকেই নিচে ফেলে দিতাম; আর তাতে সব জর্মন সুখী হতো।' এমন একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রতিদিনই আঁকা যেতে পারে বাঙলাদেশে, তাতে সুখী হবে কোটি কোটি বাঙালি; কিন্তু ওই ব্যঙ্গচিত্র আঁকা কিছুতেই সম্ভব নয় বাঙলাদেশে। রাজনীতিক স্বাধীনতায় যা সম্ভব, রাজনীতিক স্বাধীনতাহীনতায় তা সম্ভব নয়। পাকিস্থানপর্বে বাঙলা একাডেমীতে আজিজের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রর্দনীর কথা মনে পড়েছে। প্রতিটি ব্যঙ্গচিত্রে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করা হয় আইউব ও তার ভৃত্যদের। আইউবের দুই বড়ো বাঙালি ভৃত্য ছিলো খান আবদুস সবুর খান (নামে সে আইউবকে নকল করতে গিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো প্রভুকে), ও ফ-কা চৌধুরী [এ-লোকটি, যার নাম ছিলো সম্ভবত ফজলুল কাদের চৌধুরী, সর্বজনঅপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো ফ-কা চৌধুরী নামে]। ওই দুই ভৃত্য তখন পাকিস্থানের স্পিকার হওয়ার জন্যে ল'ড়ে চলছে। তারা দুজনও এসেছিলো প্রদর্শনী দেখতে। আজিজ তাদের ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়ে চলছে, আর আমরা প্রবল বিদ্রূপ ক'রে হাসছি; বিশেষ ক'রে একটি চিত্রের কথা ভেবে। সে-চিত্রটির সামনে এসে থেমে গেলো আজিজ, ও দুই ভৃত্য;—সবুর রুমালে মুখ মুছতে, আর ফ-কা টুপি দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। ব্যঙ্গচিত্রটিতে ছিলো দুটি গাধা-একটির নাম সবুর, আরেকটির নাম ফ-কা-স্পিকার নামক মুলোর লোভে ছুটে চলছে সামনের দিকে। ওই ভৃত্যরা সেদিন অপমানে লাল হয়েছিলো, কিন্তু ব্যঙ্গচিত্র বন্ধ করার জন্যে উঠেপ'ড়ে লাগে নি। পাকিস্থানেও ছিলো শিল্পীর স্বাধীনতা, কিন্তু নেই স্বাধীন বাঙলাদেশে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কৌতুককর প্রতিবেদনও। এটা ঠিক, কৌতুক খুব মারাত্মক জিনিস; অনেক সময় তা আগ্নেয়াস্ত্রের থেকেও তীব্র। আগ্নেয়াস্ত্র হত্যা করে, আর কৌতুক উপহাস করে। মানুষ তাকেই হত্যা করে, যাকে শক্তিমান মনে করে; আর উপহাস করে তাকে, যাকে কোনো মূল্য দেয় না। উপহাস হচ্ছে চরমতম সমালোচনা, তা হত্যার থেকেও মারাত্মক। তবে সভ্যতার একটি গুণ হচ্ছে সভ্যতা উপহাস সহ্য করে; আর অসভ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কোনো সহ্যশক্তি নেই। অসভ্যতা নিজেকে সংশোধন করে না, সমালোচককে সমাধান করে। আমাদের শক্তিমানেরা কৌতুক সহ্য করে না; কারণ তারা জানে তাদের মতো কৌতুককর আর কিছু নেই; তারা জানে তারা সকলের উপহাসের পাত্র। তারা ব্যঙ্গচিত্রের জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত বিষয়। জনাব ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়, বেগম ব্যঙ্গচিত্রের বিষয়, দাসীরা বিষয়। চারপাশে ছড়িয়ে আছে সজীব মাংসল ব্যঙ্গচিত্রগণ, কিন্তু তাদের আঁকা যাবে না। টেলিভিশনে যখন দেখি তাদের মনে হয় রঙিন ব্যঙ্গচিত্র দেখে চলছি; তাদের প্রতিটি ভঙ্গি আর ভাষাভঙ্গি ব্যঙ্গচলচ্চিত্র; কিন্তু তা আঁকা যাবে না। তাই বাঙলাদেশে চিত্রকলার

www.BDeBooks.Com

একটি শাখা নষ্ট হয়ে গেছে, রুদ্ধ হয়ে গেছে শিল্পীদের রাজনীতিক ভাষ্য। কোনো কিছুর সুস্থ বিকাশ রোধ করা হ'লে দেখা দেয় তার অসুস্থ বিকাশ; এবং বাঙলাদেশে ঘটেছে তাই। বাঙলাদেশে ব্যঙ্গচিত্রকর লোপ পেয়েছে, সেখানে দেখা দিয়েছে গোপালভাঁড়েরা। ব্যঙ্গচিত্রকরেরা ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে না পেরে নিজেরাই হয়ে উঠছে ব্যঙ্গচিত্র। তাদের প্রধান কাজ যেখানে রাজনীতিক কৌতুক ও ভাষ্য রচনা, সেখানে তারা মেতে উঠেছে সামাজিক ভাঁড়ামোতে; এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে রাষ্ট্র ও সমাজের শত্রুদেরই। কিশোরদের জন্যে কয়েকটি ব্যঙ্গপত্রিকা বেরোয় এখানে, যেগুলো নানা বিকারের শিকার। সত্য প্রকাশ করতে না পেরে, যাদের তারা আঘাত করতে চায় তাদের আঘাত করতে না পেরে পত্রিকাগুলো ডুবে আছে অশিল্পের আবর্জনায়। একটি সাপ্তাহিক ও দৈনিকের ভাঁড়ামোতে অনেক তরুণতরুণীর রুচিই নষ্ট হয়ে গেছে, অন্ধ হয়ে পড়েছে রাজনীতিক দৃষ্টি। দেশে রাজনীতিক স্বাধীনতা থাকলে এমন হতো না। বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যঙ্গচিত্র সম্পর্কে কোনো নিষেধ নেই, কিন্তু তবু কেনো আঁকা হয় না প্রখর ব্যঙ্গচিত্র? এর কারণ, তাতে লেখা আছে কম, কিন্তু অলিখিত আছে অনেক বেশি। খুব বড়ো ক'রে একটি কথা, অদৃশ্য অক্ষরে, লেখা রয়েছে যে সত্য প্রকাশ বা চিত্রণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই চারপাশ ভ'রে উঠছে মিথ্যায়। রাজনীতিক স্বাধীনতা একটি জাতিকে পুরোপুরি মিথ্যাচারী করে তুলেছে; সে সত্য লিখতে পারছে না, সত্য আঁকতে পারছে না। তার লেখা মিথ্যা, তার চিত্র মিথ্যা। তার বাস্তব মিথ্যা তার স্বপ্ন মিথ্যা। প্রকৃত স্বাধীনতার অভাব অসংখ্য উপায়ে ক্ষতি করে জাতির। ব্যঙ্গচিত্রের এলাকায় কতোটা ক্ষতি হচ্ছে, তার একটু হিশেব নেয়া যাক। যদি সৎ ব্যঙ্গচিত্রের স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে পেতাম শিল্পীদের রাজনীতিক ভাষ্য, রচিত হতো এ-সময়ের সামাজিক রাজনীতিক দলিল, বিকাশ ঘটতো ব্যঙ্গচিত্রের নানা প্রকরণের, কৌতুকবোধের উৎকর্ষ সাধিত হতো; বিকশিত হতো সভ্যতা। শুধু স্বাধীনতার অভাবে ক্ষতি হচ্ছে এতোগুলো; অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মনুষ্যত্ব। চারপাশে দেখছি জীবন্ত ব্যঙ্গচিত্র, টেলিভিশন খুললেই চোখের সামনে লাফিয়ে ওঠে বানর, শিম্পাঞ্জি, কুকুর গরু, গাধা, ডাইনি, ও আরো নানা জন্তু, কিন্তু তাদের আঁকা যাবে না। এখন এগিয়ে আসা দরকার সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রবণ শিল্পীদের, গোপালভাঁড়ামো ছেড়ে চর্চা করা উচিত ব্যঙ্গচিত্রকলার। শিল্পকলার মতো স্বাধীনতাও সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে নিজেদেরই। তাদের আঁকতে হবে স্বাধীনতা।

মুসলমান কে ও কী?

কবি লালন বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন একটি সমস্যা নিয়ে। সেটা শুধু তাঁর একার সমস্যা হয়ে থাকে নি, শুধু তাঁর সময়ের সমস্যাও হয়ে থাকে নি; একটা স্বার্থপরায়ণ অন্ধ গোত্র সেটাকে সহস্রকের সমস্যায় পরিণত করেছে। লালনের সমস্যাটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় পংক্তিতে : 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, /নারী লোকের হয় কি বিধান?/বামন চিনি পৈতার প্রমাণ,/বামনী চিনি কি ধরে।' ধর্মান্ধদের কাছে মানুষের মূল্য মানুষ ব'লে নয়, মুসলমান বা হিন্দু বা খ্রিস্টান বা অন্য কিছু ব'লে। মানব জাতি বহু ধর্মের দ্বারা বিভক্ত পরস্পরবিরোধী ধার্মিক প্রাণীদের সমষ্টি। যে-ধর্মের মানুষেরা যতো পিছিয়ে আছে, যারা বাস করে যতো বেশি অতীতে, তারা ততো বেশি ধর্মান্ধ। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ে এখন আর কে খাঁটি, কে ভেজাল, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এখনো এটা দেখা যায়। মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়ে উলেমা বা যাজকগোত্রটি মাঝেমাঝেই 'ফতোয়া' দিয়ে থাকে। ফতোয়া দেয়া তাদের এক প্রিয় ব্যবসা। এরা সাধারণ মানুষকে খুব ছোটোখাটো কল্পিত ত্রুটির জন্যে মুসলমান নয় বলে ঘোষণা ক'রে তাদের নানা বিপদে ফেলে এসেছে বহু শতক ধ'রে। বহু অমর প্রতিভাকে তারা ঘোষণা করেছে কাফের। তাদের ফতোয়া যে বিশুদ্ধ ধর্মসম্মত, এমন নয়; অধিকাংশ সময়ই তারা নানা স্বার্থে ফতোয়া জারি ক'রে থাকে। তাদের ফতোয়া স্বার্থচালিত আর দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত। হয়তো এমনও হয়েছে যে কোনো গরিব চাষীর বউকে দিলে ধরেছে মৌলভি সাবের, মেয়েটির মাংস সুস্বাদু মনে হয়েছে মৌলভি ধর্মব্যবসায়ীর -তার চার নম্বর শয্যাটি খালি প'ড়ে আছে; তাই মৌলভি সাব এক ফতোয়ায় তালাক ঘটিয়ে দিলো তাদের। নরম ও গরম হয়ে উঠলো মৌলভি সাবের চার নম্বর শয্যা। উলেমা শ্রেণীটি সাধারণত হয়ে থাকে প্রভুগত। যে-ই ক্ষমতা দখল করে, তারা পক্ষ নেয় তারই। রাজার পক্ষে ফতোয়া দিতে তারা কখনো দ্বিধা করে না, তাদের বিবেক ও ধর্মবোধ এতে কখনো বিচলিত হয় না। মধ্যযুগে তারা রাজাবাদশাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করেছে মনগড়া ফতোয়া দিয়ে। রাজা অসংখ্য মানুষ খুন করেছে, তারা ফতোয়া দিয়েছে যে তা ধর্মসম্মত হয়েছে; রাজা ব্যভিচার বা অজাচার করেছে, তারা ফতোয়া দিয়ে রাজাকে মহাধার্মিকরূপে ঘোষণা করেছে। পাকিস্থানপর্বে শর্ষিণা ও অন্যান্য পীরদের অসৎ নানা ফতোয়া জারি হয়েছে, তাতে স্বৈরাচারীরা হয়েছে মহাপুরুষ; আর ধর্ষণ হয়েছে জায়েজ। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের মর্মস্পর্শী নানা ফতোয়া ভোগ করেছে বাঙালি। কাজী নজরুল ইসলাম এখন রাষ্ট্রধর্মী বাঙলাদেশের জাতীয় কবি–খাঁটি ইসলামী কবি। এক সময় ফতোয়াবাজদের

www.BDeBooks.Com

জ্বালায় তিনি অস্থির ছিলেন; আর এখন যদি তিনি কবিতা লিখতেন, তবে আজ যারা তাকে জাতীয় কবি বানিয়েছে, তারাই তাঁকে কাফের ব'লে তার শির ছিঁড়তো। তখনকার এক খাঁটি মৌলভি ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। তিনি বেশি দিন আগে নয়, ১৩২৯-এ নজরুল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, 'লোকটা মুসলমান না শয়তান?' তারপর মুনশী সাব লিখেছেন :

> এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। হতভাগ্য যুবকটি ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই ... দুঃখের বিষয় অজ্ঞান যুবক এখনও আপনাকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেছে! ... নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে। লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার। ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।... এইরূপ ধর্মদ্রোহী কুবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, পুনর্জন্ম-বিশ্বাসী কাফের বলিয়াই পরিগণিত হইবে। খাঁটি ইসলামী আমলকারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।

এই হচ্ছেন খাঁটি মুসলমানের ফতোয়ায় রাষ্ট্রধর্মের দেশের জাতীয় কবি।

সুযোগ পেলেই দেখা দেয় সুবিধাবাদী ফতোয়াবাদীরা, যেমন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে পাকিস্থানে; সময় ও সুযোগমতো দেখা দেবে বাঙলাদেশেও। পাকিস্থানি ফতোয়াবাজগণ ফতোয়া জারি করেছে যে বেনজির মুসলমান নয়। তাকে কাফের ব'লে ঘোষণার জন্যে মামলাও করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে ওই উলেমা আর মাশাইখ'রা কি মুসলমান? এ-ফতোয়াবাজরা ইসলামের কেউ নয়, তারা উলেমার ছদ্মবেশে ইসলামের শত্রু; এবং অস্থিতে দুশ্চরিত্র। এরা জিয়াউল হকের কোনো বিরোধিতা করে নি, তার সাথে হাত মিলিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করেছে, পাকিস্থানকে রসাতলে নিয়ে গেছে; এখন আবার সামরিকসংঘের সাথে হাত মিলিয়ে পাকিস্থানকে আরো রসাতলে নেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এরা সামরিক চক্রের চর। উলেমা শ্রেণীটি আধুনিক কোনো জ্ঞানই ধারণ করে না, কিন্তু তারাই ফতোয়া দেয় আধুনিক, প্রগতিশীল ও জ্ঞানীদের সম্পর্কে। মুসলমানদের ইতিহাসে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাঁদের নিয়ে গৌরব করে মুসলমানেরা, তাঁরা প্রায় সবাই এ-ফতোয়াবাজদের শিকার। ফতোয়াবাজগণ মুসলমানদের কিছু দেয় নি, সমৃদ্ধ করে নি মুসলমানের ইতিহাসকে, বরং ক্ষতি করেছে শোচনীয়ভাবে; এবং প্রগতিশীলদের পেছনে লেগে রয়েছে জল্লাদের মতো। এদের হিংস্রতায়ই মুসলমানেরা অনেক পিছিয়ে আছে। একলাখ মৌলভি কোনো উপকারে আসে না, যতোটা উপকারে আসেন একজন বৈজ্ঞানিক; লাখলাখ মুনশী রেয়াজুদ্দীন জন্ম না নিলে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু একজন নজরুল জন্ম না নিলে মুসলমানের ইতিহাস জুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। মুসলমানের ইতিহাস থেকে অসংখ্য ফতোয়াবাজের নাম মুছে গেছে, টিকে আছে তাঁদের নাম যারা জীবনে লাঞ্ছিত হয়েছেন, অমরতা অর্জন করেছেন মৃত্যুতে। বেনজিরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা

বেশ পুরোনো অভিযোগ, যা অনেকের বিরুদ্ধেই আনা যায় আর আনা হয়েছে। বেনজিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ;– সে নাকি চোরের হাত কেটে ফেলার ইসলামি বিধানের বিরোধী। এ-অভিযোগ শুধু তার একার বিরুদ্ধে তোলা বদমাশি, কেননা কোটি কোটি মুসলমান এ দণ্ডের বিরোধী। ইসলাম আবির্ভূত হয়েছিলো একটি বিশেষ ভূভাগে, বিশেষ সময়ে; তাই তার বিধিবিধানও প্রণীত হয়েছিলো বিশেষভাবে ওই সময় ও সমাজের জন্যেই। দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম যদি বাঙলাদেশে আবির্ভূত হতো, তবে তার বিধিবিধান অন্যরকম হতো। তখনকার আরবি সমাজের আদিমতা রোধের জন্য দরকার ছিলো কিছু কঠোর বিধি;– হাত কাটা বা ঢিল ছোঁড়া যার উদাহরণ। চার স্ত্রীর বিধানও ওই সময়েরই। যে-আরব পুরুষেরা শতো শতো স্ত্রী গ্রহণ করতো, তাদের লালসা মেটানোর জন্যে চারটি স্ত্রী শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছিলো; এর চেয়ে কম করা হলে হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণই করতো না, বরং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতো। আজকের আরব দেখলেই বোঝা যায় দেড় হাজার বছর আগে কী ভয়াবহ ছিলো ওই মরুভূমি। তাই সে-সময়ের সব বিধান অবিকল আজ আর চলতে পারে না। এতে যে ইসলামের খুব একটা যায় আসে, এমন নয়; এতে ইসলামের একটুও ক্ষতি হয় না; তবে ক্ষতি হয় স্বার্থপরায়ণ সুবিধাবাদীদের। তারা নিজেদের স্বার্থেই ওই সব বিধি নিয়ে মাতামাতি করে। তারা জনসমর্থন পায় না ব'লে সামরিকচক্রের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তারা ভোটের জন্যে ইসলামের দোহাই দেয়। গত নির্বাচনে পাকিস্থানের মানুষ বর্জন করে বন্দুক ও ফতোয়াবাজদের ধর্মকে; তারা ফতোয়াবাজদের থেকে অনেক বেশি ধার্মিক। আবার যদি পাকিস্তানে শুদ্ধ নির্বাচন হয়, জনগণ বর্জন করবে ধর্ম ও বন্দুককে; তারা ভোট দেবে এই তরুণীকেই, যে হাত কাটায় ঢিল ছোঁড়ায় বিশ্বাস করে না। এখন দুটি শক্তিমান বস্তুকে মুক্ত করা দরকার দুষ্টদের হাত থেকে; একটি ধর্ম, অন্যটি বন্দুক। ধর্মকে আর ছেড়ে দেয়া যায় না বিশেষ একটি সংঘের হাতে। দুটিকেই উদ্ধার করা দরকার অবিলম্বে।

www.BDeBooks.Com

তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড

নজরুলকে যারা জাতীয় কবি উপাধি দিয়েছে, তাদের প্রধান প্রতিক্রিয়াশীল প্রবক্তা সৈয়দ আলী আহসান, সাড়ে চার দশক আগে ১৩৫৩ সালে, লিখেছিলেন, 'নজরুলকে জাতীয় কবি বলা নিজেদের প্রবোধ দেওয়া মাত্র'; আর নজরুল যেনো তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাসক সম্প্রদায়ের ভণ্ডামোর কথা ভেবেই ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, 'তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।' ভণ্ড কাকে বলে? ভণ্ড সে, যে মুখে যা বলে মনে তা বিশ্বাস করে না; ভণ্ড সে, যে মনে যা বিশ্বাস করে মুখে তা বলে না; ভণ্ড সে, যে মুখে সুনীতির খই ফোটায় আর দিনরাত অন্ধকারে লিপ্ত থাকে দুর্নীতিতে। এখনকার শাসকসম্প্রদায়ের চরিত্র মাত্র একটি শব্দে ফুটিয়ে তোলার জন্যে দরকারী শব্দটি হচ্ছে 'ভণ্ড'। একগুচ্ছ ভণ্ড সম্মিলিত হয়েছে শাসকসংঘের। তারা দখল করেছে সব মিনার, দখল করেছে সবচেয়ে উচুঁ মিনারটি, যার নাম রাষ্ট্র; আর চূড়োয় চ'ড়ে গেয়ে চলেছে স্বার্থের জয়। ভণ্ড রয়েছে নানাশ্রেণীর; তাদের শিরোমণি ধর্মভণ্ডর। ধর্মকে ভণ্ডামোর বিষয় করা ভণ্ডামোর শেষ ধাপ। এরপর ভণ্ডামোর আর কোনো ধাপ নেই, যা আছে তার নাম হচ্ছে বিনাশ। সাম্প্রতিক শাসকেরা পৌঁছে গেছে ভণ্ডামোর শেষ ধাপে, ভণ্ডামোর এভারেস্টে, উচ্চতম মিনারে। তাদের জীবনে ধর্মের কোনো ছোঁয়া নেই। তাদের আচরণে নেই ধর্মের সামান্য স্পর্শ, ধর্ম থেকে কোটি কিলোমিটার দূরে তারা;– অবিশ্বাসীরাও তাদের থেকে অনেক ধার্মিক, তবু তারাই হয়ে উঠেছে ধর্মের ক্যানভাসার। মোড়ে মোড়ে তারা বিক্রি ক'রে চলছে ধর্ম; ধর্মকে তারা পরিণত করেছে শস্তা পণ্যে। রাষ্ট্রধর্ম তাদের এক নম্বর ভণ্ডামো। জনগণের ধর্ম ছিলো, তাই তাদের কোনো দরকার ছিলো না রাষ্ট্রধর্মের; শাসকদের ধর্ম নেই, তাদের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে স্বার্থ, তাই তাদের দরকার রাষ্ট্রধর্ম; যা দিয়ে তারা ঠকাতে পারে সাধারণ মানুষকে। ধর্ম ভণ্ডামোতে তারা ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে, মধ্যযুগের মোল্লাদেরও। তারা নামাজ পড়ে না, তবে মসজিদে যায় মহাসমারোহে, ভিডিও যন্ত্রপাতি নিয়ে, ও প্রচার করে তার রঙিন চিত্র; তারা গিলাফ জড়িয়ে কাঁদে, তারা হেলিকপটারে চ'ড়ে যায় পীরের বাড়িতে; তারা মানুষকে বাসস্থান দিতে পারে না, কিন্তু ভণ্ড পীরকে বিনামূল্যে দেয় বিঘা বিঘা জমি। ভণ্ডামো একবার শুরু করলে দিন দিন তার মাত্রা বাড়াতে হয়, নব নব ভণ্ডামো দিয়ে উত্তেজিত রাখতে হয় মানুষকে। তাদের ভণ্ডামোর শোচনীয় রূপ দেখি ঈদের আগের এক ঘোষণায়। ঈদের আগে হঠাৎ তাদের চোখ পড়ে গরিব নারীদের শরীরে, ওই গরিব নারীরা আটহাতি শাড়ি পরে দেখে আস্তাগফেরুল্লাহ ক'রে উঠে তারা, গরিব নারীদের ধর্মহীনতায় আঁৎকে ওঠে ধার্মিকেরা। আদেশ দেয় যে বারো হাতের নিচে

শাড়ি বানানো যাবে না, পরা যাবে না। গরিব নারীরা যে- ত্যানা পরে, তাকে শাড়ি বলা সুভাষণ মাত্র; ওইটুকু য তারা পরতে পায় এইতো বেশি। রাষ্ট্রধর্মতো তাদের জন্যে বারো হাতের শাড়ির ব্যবস্থা করেনি। আমাদের ধর্মভণ্ডরা বেহেশতে আছে, তাই তারা জানে না দোজখের কী অবস্থা। ধার্মিকেরা অবশ্য ঘোষণা করতে পারতো যে ভিখিরিণীকেও পরতে হবে জামদানি, কাগজ-কুডনিকেও পরতে হবে কাতান; কিন্তু তারা তা করে নি, অশেষ দয়ায়। ওই গরিব নারীরা আট হাতের শাড়ি পরে লজ্জা নিবারণ করে; আর ধার্মিকদের গোত্রের নারীরা বারো হাতের শাড়ি পরে নগ্ন থাকে, এটা চোখে পড়ে না তাদের। ভণ্ডামোর আরেক শোচনীয় রূপ প্রকাশ করেছে তারা দশ টাকার নোটে। তাতে ছেপে দিয়েছে 'আল্লাহো আকবর'। এ- ভণ্ডরা অর্থগৃধ্নু, টাকাকেই তারা মনে করে সবচেয়ে পবিত্র, তাই টাকার গায়ে ছেপে দিয়েছে ধর্মের শ্লোক। তারা ভেবেছে এতে আল্লাকে খুব ওপরে ওঠানো হলো; তাকে যে রসাতলে নামিয়ে দেয়া হলো তা বুঝতে পারলো না ভণ্ডরা। টাকা খুব দরকারী; কিন্তু খুবই অপবিত্র। ভণ্ডরা ভেবেছে, তারা যেমন নিকৃষ্ট তোশামুদি চায়, আল্লাও চায় তেমন নিকৃষ্ট তোশামোদ। টাকার সঙ্গে সম্পর্ক শয়তানের; প্রতিটি টাকার গায় অদৃশ্য অক্ষরে বড়ো বড়ো ক'রে শয়তানের নাম লেখা; আর আমাদের ভণ্ডরা সেখানে লিখেছে 'আল্লাহো আকবর।' ওই টাকা কেউ জুতোর শুকতলিতে রাখবে, কেউ পতিতাকে দেবে, লুকিয়ে রাখবে মলভাণ্ডের নিচে; শক্তিমানেরা ওই টাকা ফিরে পাবে ঘুষ রূপে। ধর্মভণ্ডরা আল্লাকে যতোটা রসাতলে নামিয়েছে, এতো আর কেউ নামায় নি।

ভণ্ডদের হাত থেকে যেখানে আল্লাই রক্ষা পায় নি, সেখানে রবীন্দ্রনাথ যে রক্ষা পাবেন না এটা তো সহজ কথা। এরা এতোকাল ছিল রবীন্দ্রনাথের শত্রু, রবীন্দ্রনাথের সাথে অনেক লড়াই করেছে তারা; কিন্তু শক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে পরাজিত করতে পারে নি ব'লে এবার তাকে পরিণত করেছে ভণ্ডামোয়। তারা বুঝেছে রবীন্দ্রনাকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে অধিকার করা, যেমন তারা নজরুলকে দখল ক'রে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাদের কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন মানুষের মুক্তিতে, তারা বিশ্বাস করে শৃঙ্খলে; রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী স্বাধীনতায়, তারা বিশ্বাস করে স্বৈরাচারে। এবার শিলাইদহে তারা শৃঙ্খলিত করেছে রবীন্দ্রনাথকেও। রবীন্দ্রানুরাগের ব্যাপক অভিনয় করেছে তারা, ভবিষ্যতে আরো অনুরাগ দেখাবে; কিন্তু তাদের রবীন্দ্রানুরাগ এক জঘন্য ভণ্ডামো। এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। তারা পবিত্র কোরআন আবৃত্তি ক'রে রবীন্দ্রজয়ন্তী শুরু করেছে, অর্থাৎ শুরুতেই রবীন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিয়েছে রাষ্ট্রধর্মে। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো ধর্মের কবি নন; তিনি প্রথাগত কোনো ঈশ্বরেও বিশ্বাসী ছিলেন না; অতীন্দ্রিয়বাদীদের মতো তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর একান্ত 'প্রভু'তে। ওই প্রভু কোনো ধর্মের নয়; তিনি অন্যকেও তাঁর প্রভুতে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করেন নি। কিন্তু তাঁকে এবার ইসলামে দীক্ষা দেয়া হয়েছে। এরপর রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহ প্রাপ্ত ভাড়াটে রবীন্দ্রবিদ দেখা দেবে, যারা পুরোপুরি নষ্ট করবে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথে তারা খুঁজে পাবে আল্লাকে, যেমন পাকিস্তানপর্বে অনেকে খুঁজে পেয়েছিলো; তারা রবীন্দ্রনাথকে পাবে গণতন্ত্র-বিরোধিতা, পাবে

www.BDeBooks.Com

একনায়কত্বের প্রতি অনুরাগ। তারা রবীন্দ্রনাথকে পরিণত করবে এক ধর্মান্ধ কবিতে। এবার শিলাইদহে রসাতলে গেছে একগোত্র 'প্রগতিশীল'ও। শিলাইদহ নামটিকে আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়। 'দহ' শব্দের অর্থ 'গর্ত'। শিলাইদহ ওই প্রগতিশীলদের জন্যে পতনের গর্তরূপে দেখা দিয়েছে, তাদের সামনে মুখ মেলে দিয়েছে গভীর রসাতল; তারা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রসাতলে। সেখান থেকে তারা আর উঠে আসতে পারবে না। এদেশে প্রগতিশীলেরা যেভাবে নষ্ট হয়েছে আর কেউ তেমনভাবে নষ্ট হয় নি। এবার একপাল 'প্রগতিশীল' স্বৈরাচারের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে; এরপর তারা গেয়ে যাবে স্বৈরাচারের জয়গান। রবীন্দ্রনাথও তাদের রক্ষা করতে পারবেন না। এদের স্বভাব কুকুরের মতো; এ টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলে এরা দল বেঁধে গলায় শেকল পরে, শেকলের জয়গান করে। তারা বুঝতেও পারলো না শাসকসম্প্রদায়ের রবীন্দ্রচর্চা ভণ্ডামোচর্চা; রবীন্দ্রনাথকে কলঙ্কিত করার জন্যেই তারা মেতে উঠেছে রবিস্তবে। রবীন্দ্রনাথকে এখন থেকে তারা মানুষের বিরুদ্ধে লাগাবে। যে-রবীন্দ্রনাথকে তারা লড়াই ক'রে কাবু করতে পারে নি, তাঁকে কাবু করেছে ভণ্ডামো দিয়ে; যে-রবীন্দ্রনাথের নাম তারা মুছে দিতে চেয়েছে মানুষের মন থেকে, তাঁকে তারা কেড়ে নিয়েছে ভণ্ডামো দিয়ে। রবীন্দ্রনাথকে তারা বশে রাখতে পারবে না; আকাশকে কেউ শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে না। তবে ভণ্ডরা উঠছে সব মিনারে, তারা গেয়ে চলছে স্বার্থের জয়।

ক্যাঙ্গারু নয় বাদুড় বুদ্ধিজীবী

বাঙলাদেশ এমন এলাকা, যেখানে একদিনে লোপ পায় সমস্ত যশ-খ্যাতি মহিমা। কেউ হয়তো অনেক সাধনায় মুখটিকে শুভ্র ক'রে তুলেছেন, কিন্তু তার মুখে লাগে এমন কালিমা, যা অনপনেয়। ওই কালিমা অর্জনে তাঁর ভূমিকা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। ক্যাঙ্গারুদের কথায় ধরা যাক। খুবই বিখ্যাত জীব ক্যাঙ্গারু, থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, আমার খুব ভাল লাগে অশেষ বাৎসল্যপরায়ণ ওই জীবদের। বাঙলাদেশের কথা ওরা জানে না; বাঙলাদেশের প্রাত্যহিক পতনের সাথে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা প্রগতি বোঝে না, প্রতিক্রিয়ার কথা শোনে নি, কখনো রাজনীতি করে না, ওরা বুদ্ধিজীবী হ'তে কখনো চায় নি। এক লেখক 'বুদ্ধিজীবী' অভিধাটি, অমনি সংস্পর্শদোষে কালিমা লাগালো নির্দোষ ক্যাঙ্গারুদের মুখে। একটি পত্রিকায় এক আবুল হোসেন সুবিধাবাদী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রহীনতা সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশ করেছেন, ওই বুদ্ধিজীবীদের অভিধা দিয়েছেন 'ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবী'। তাঁরা লাফিয়ে লাফিয়ে এক মঞ্চ থেকে আরেক মঞ্চে যান, শহীদ মিনার থেকে ছোটেন যাদুঘরের দিকে, কিছুক্ষণ প্রগতিশীলতার চর্চা ক'রে প্রাণভ'রে করেন সুবিধা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার চর্চা। ওই লেখক ক্যাঙ্গারুদের মুখে যে কালিমা লেপন করেছেন, তাতে আমি খুবই ব্যথিত। আবুল হোসেন সম্ভবত ছদ্মনাম, ছদ্মনাম খুবই সন্দেহজনক। তিনি নিজেও কি কোনো মুখোশপরা ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবী? তাঁর লেখাটি পাঠকের অগোচরেই হারিয়ে যেতো, কিন্তু শামসুর রাহমান তাঁর সংবাদ'-এর কলামে 'ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবী'দের নিয়ে আলোচনা করে অভিধাটিকে জনপ্রিয় এবং নিজেকে বিপন্ন করে তুলেছেন। ওই বুদ্ধিজীবীদের যদি বলি 'ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবী' তবে 'সংবাদকে বলতে পারি ক্যাঙ্গারু সংবাদপত্র'; এটি প্রগতিশীলতার কথা বলে, আবার ছুটে চলে সুবিধার দিকে। 'সংবাদ' শামসুর রাহমানের লেখাটি ছেপেছে ঠিকই, কিন্তু লেখাটির নিচে একটি পাদটীকা যোগ করেছে : 'এই নিবন্ধের বক্তব্য লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত।' পাদটীকাটি আপত্তিকর। প্রতিটি লেখাই লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত; তাই 'সংবাদ' পাদটীকাটি ছেপে শামসুর রাহমানকে অস্বীকার করেছে। কোনো পত্রিকা যখন কারো লেখা ছাপে, তখন ওই লেখার দায়িত্ব পত্রিকাটিকেই প্রথম নিতে হয়; 'সংবাদ' সে-দায়িত্ব অস্বীকার করে চরম আদর্শহীনতা ও সুবিধাবাদিতার পরিচয় দিয়েছে। আর সেখানেই থেমে থাকে নি। একদিন পরেই শামসুর রাহমানকে আক্রমণ ক'রে একটি অত্যন্ত অশালীন চিঠি প্রকাশ করেছে। ওই চিঠির নিচে লেখকের নাম আছে, ঠিকানাও আছে, কিন্তু মনে হয় সবটাই বানানো; শামসুর রাহমানকে অপমান করার জন্যেই সম্ভবত উৎপাদন করা হয়েছে ওই

www.BDeBooks.Com

অভদ্র চিঠিটি। তাতে যাদুঘরের এরশাদঅনুগত সুবিধাবাদী পরিচালককে বলা হয়েছে 'প্রতিভাবান', আর শামসুর রাহমানকে 'একজন প্রধান কবি' ব'লে প্রধান-এর পরে বন্ধনিতে ছাপা হয়েছে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। হতে পারেন শামসুর রাহমান গৌণ কবি। তাতে কী আসে যায়; কিন্তু তাকে 'একজন প্রধান (?) কবি' ব'লে তার সাথে বন্ধনির ভেতরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার প্রচণ্ড অশালীনতা, অভদ্রতা। 'সংবাদ' যে-ভূমিকা নিয়েছে, তার সাথে 'সংগ্রাম', 'ইনকিলাব'-এর ভূমিকার ও চরিত্রের কোনো পার্থক্য নেই। এরপর 'সংবাদ' যেহেতু নিজের লেখককেই অপমান করতে চায়, তাই উৎপাদন ক'রে চলছে এসব অশ্লীল পত্র। শামসুর রাহমান এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, তিনি কাদের মধ্যে আছেন। স্বার্থে আঘাত লাগলে সুবিধাবাদী 'ভদ্রলোক' বান্ধবেরা কেমন মরিয়া অভদ্র হয়ে উঠতে পারে, তিনি এখন তা দেখছেন। দেশে শুধু ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবীই নেই, আছে ক্যাঙ্গারু সংবাদপত্রও।

ক্যাঙ্গারু বুদ্ধিজীবী অভিধাটি সপ্তাহখানেকের জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তবে এটিকে আমার যথাযথ মনে হয় না। ক্যাঙ্গারু বাঙালি নয়, বাঙলাদেশিও নয়; এবং ওই ছদ্মপ্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীদের সাথে ক্যাঙ্গারুদের কোনো প্রজাতিগত সম্পর্ক নেই। অন্য একটি প্রাণীর সাথেই ক্যাঙ্গারুদের কোনো প্রজাতিগত সম্পর্ক গভীর, আর ওই প্রাণীর সাথেই এবং এ বুদ্ধিজীবীদের প্রজাতিগত সম্পর্ক নেই। অন্য একটি প্রাণীর সাথেই বাঙালি ও বাঙলাদেশি। ওই প্রাণীটি হচ্ছে বাদুড়। তাই ওই ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের 'বাদড় বুদ্ধিজীবী' বলাই শ্রেয়। বাদুড়দের চরিত্রের সাথে এদের মিল এতো বিস্ময়কর যে বোঝার পর একটুও বিস্ময় থাকে না। বাদুড়েরা পাখিও নয়, পশুও নয়; পাখির মতো এরা আকাশে ওড়ে আবার পশুর মতো স্তন্য পান করে। এ-বুদ্ধিজীবীরাও প্রগতিশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীলও নয়; এরা প্রগতির সময় প্রগতিতে থাকে, সুবিধার সময় প্রতিক্রিয়ায় থাকে। এরা সকালে শহীদ মিনারে থাকে, বিকেলে যাদুঘরে থাকে। বাদুড়েরা ঝুলে থাকতে খুবই দক্ষ; এমন চমৎকার তাদের পেছনে পা যে খামচি মেরে থাকলে মরার পরও ওই খামছি খোলে না। এ-বুদ্ধিজীবীরাও খামছি মেরে থাকতে দক্ষ; এরা প্রগতিতে খামছি মেরে থাকে, আবার সুবিধায় খামছি দিতেও দারুণ দক্ষ। বিভিন্ন দেশের পুরাণে বাদুড়েরা অন্ধকার ও রোমাঞ্চকর রহস্যের প্রতীক; এ-বুদ্ধিজীবীরাও তাই। খুবই রহস্যময় তারা, মানুষ কিছুতেই তাদের বুঝে উঠতে পারে না; তারা শুধু মানুষকে রোমাঞ্চিত ক'রে চলে। বাদুড়েরা অন্ধকারের জীব, আলোআঁধারি তাদের পছন্দ; দিনভর গুহায় ঝুলে থাকে আর বেরোয় অন্ধকারে। এই বুদ্ধিজীবীরা আলোআঁধারি খুব ভালোবাসে, আলোকে আঁধারে পরিণত করে; অন্ধকারে তারা কোথায় যায় সাধারণ মানুষ তা জানতে পারে না। বাদুড়েরা চোখে দেখে না, শুধু শোনে; অন্যের আওয়াজ তারা শোনে, আর নিজেরা নানা আওয়াজ সৃষ্টি করে। এ-বুদ্ধিজীবীরাও আওয়াজজীবী; তারা মঞ্চ থেকে মঞ্চে নানা আওয়াজ সৃষ্টি করে, আর অন্ধকারেও অন্যের আওয়াজ শুনে তারা চলতে পারে। আওয়াজ সৃষ্টির সুযোগ পেলে তারা ছাড়ে না। মঞ্চে উঠে তারা শুধু আওয়াজ করতে থাকে, তবে বাদুড়ের আওয়াজেরও অর্থ আছে, কিন্তু এ-বুদ্ধিজীবীদের আওয়াজের অধিকাংশই নিরর্থক; তারা

নিজেরাও নিজেদের আওয়াজের অর্থ বোঝে না, নিজেদের আওয়াজে বিশ্বাস করে না। ভোরবেলা তারা একরকম আওয়াজ করে, দুপুরে করে অন্য আওয়াজ, বিকেলে করে ভিন্ন আওয়াজ আর রাতের অন্ধকারে করে সুবিধার আওয়াজ, বাদুড়ের দেহের তাপের মতো এ-বুদ্ধিজীবীদের দেহতাপও পরিবেশ অনুসারে ওঠানামা করে। গরম পরিবেশে বাদুড় তার দেহের তাপ উঁচু রাখে, বেশ খাপ খাইয়ে নেয়; আবার যখন কোনো ঠাণ্ডা পরিবেশে যায়, তখন দেহের তাপ কমিয়ে নেয়। বাদুড় বুদ্ধিজীবীরাও তেমনি; শহীদ মিনারে তাদের দেহের তাপ একরকম থাকে, যাদুঘরে আরেক রকম হয়; বিরোধী মিছিলে থাকার সময় তারা দেহের তাপ বাড়িয়ে নেয়, আবার সরকারের কাছে ছোটার সময় তাপ কমিয়ে নেয়। তাই সব দিক থেকে বাদুড়ের সাথেই এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; তাই এদের বাদুড় বুদ্ধিজীবী বলায়ই যথাযথ। বাদুড় বুদ্ধিজীবীরাই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে সব কিছু। তাদের কোনো বিশ্বাস নেই, সততা নেই নীতি নেই; তাদের মগজ অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের মুখ থেকে যে আওয়াজ বেরোয়, তা ঘিনঘিনে পচা; তারা চেনে শুধু সুবিধা। বাদুড়েরা যেমন পাকা পেয়ারাটিকে খুঁজে পাওয়ার স্বপ্নে থাকে, তেমনি বাদুড় বুদ্ধিজীবীরাও বিভিন্ন রকম পেয়ারার লোভে আলোআঁধারিতে ছোটাছুটি করে। এদের ভদ্রতা নেই, লজ্জাও নেই। বাদুড় বুদ্ধিজীবীদের চামড়ার ডানায় এখন বাঙলাদেশ আচ্ছন্ন, অন্ধকারের দানবের মতো উড়ছে তারা। এদের ডানার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার; নইলে এখনো যে-আলোটুকু আছে, তাও তারা শুষে নেবে। সবকিছুকে ক'রে তুলবে গুহার মতো অন্ধকার।

www.BDeBooks.Com

নির্বাচন, ছাত্ররা ও ছাত্রনেতারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দা, সড়ক ও ছাত্রাবাসে এখন মিছিলের উল্লাস। ঝড়ের মতো একেকটা মিছিল আসে, দশ পনেরো বছরের পুরোনো শ্লোগানে বধির ক'রে দেয় চারপাশ, নেতাদের নাম উচ্চারিত হয় জিকিরের মতো। দু-এক দিনের মধ্যে ব্যানার উড়বে নানান রঙের, বড়ো বড়ো অক্ষরে বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের দেয়ালে লেখা হবে অনেক নাম, অসংখ্য পোস্টারে ছেয়ে যাবে প্রতিটি দেয়ালের প্রতি বর্গমিটার। পোস্টারে প্রার্থীদের মুখ ছাপা হবে, রটানো হবে তাদের নাম কৃতিত্ব। ডাকসু ও ছাত্রাবাসগুলোর নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের খুব বড়ো ঘটনা; শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, সারা দেশের জন্যেই হয়তো বড়ো ঘটনা। নির্বাচন এলে দারুণ কর্মমুখর হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঘুম থাকে না কর্তৃপক্ষের চোখে; ছাত্রনেতা ও কর্মীরা জয়ের অভিযানে ব্যস্ত থাকে দিনরাত; আর রাজনীতিক দলগুলোর নেতারা তাকিয়ে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে, কেননা ওই নির্বাচন শুধু ছাত্রনেতাদের নয়, রাজনীতিক নেতাদের নিয়তিও অনেকটা নির্ধারণ ক'রে দেয়। সশস্ত্র ত্রাতারা ক্ষমতা দখলের পর আট বছর কোনো নির্বাচন হয় নি বিশ্ববিদ্যালয়ে; তারপর নির্বাচন হয়েছিলো গত বছর। ওই নির্বাচনে তিনটি ঘটনাই মনে আছে সাধারণের। একটি হচ্ছে 'সংগ্রাম পরিষদ'-এর জন্ম; অন্যটি ছাত্রীদের বিজয় মিছিলে আক্রমণ, আরেকটি শেখ মুজিবের ছবি। তিনটি ঘটনাই আমাদের ছাত্ররাজনীতি ও দেশিক রাজনীতির জন্য তাৎপর্যবহ। সংগ্রাম পরিষদের জন্ম ছিলো একটা ঋণাত্মক ব্যাপার; যাদের মধ্যে মিল হতে পারে না, মিল হয়েছিলো তাদের মধ্যে; তাই এক বছরেই তিরোধান ঘটেছে সংগ্রাম পরিষদের। ছাত্রীমিছিলে আক্রমণের ঘটনাটি খুবই স্পর্শকাতর;- যাদের ওপর হামলা করা হয়েছিলো, তারা ছাত্রী অর্থাৎ নারী, স্পর্শকাতরতা এখানেই। কোনো ছাত্রমিছিলে এমন হামলা হ'লে ঘটনা হতো অন্যরকম; হয়তো অনেকের মাথা ফাটতো, আহত-নিহত হ'তেও পারতো কেউ কেউ; কিন্তু তা স্পর্শকাতরতা অর্জন করতো না। আমাদের রাজনীতির সঙ্গে হামলার একটা সম্পর্ক আছে। এবার ওই আক্রমণকে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে রাজনীতিকভাবে। ছাত্রীরা এর বিচার দাবি করেছে, হলের প্রাধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, কয়েকদিন হল প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিয়েছে। এটা যে শুধু সুবিচারের দাবি ছিলো, এমন নয়; তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে ভোটদাতাদের, গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে নিজেদের একটি সুন্দর ভাবমূর্তি, আর বিব্রত করতে চেয়েছে প্রতিপক্ষকে। রাজনীতি হচ্ছে রাজনীতি, এটা ছাত্রীরাও জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কতোটা উপকারে আসে? গত বছরের নির্বাচন উপকারে এসেছে কতোটা? গত বছরের

নির্বাচন উপহার দিয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও বিভিন্ন ছাত্রাবাসসংসদ। আমার জানতে ইচ্ছে ক'রে কী করেছে এক বছর ওই সংসদগুলো? ছাত্রনেতাদের লক্ষ্য কি শুধু নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব উপভোগ করা, না বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় ক'রে তোলা? শুনেছি ছাত্রাবাস সংসদগুলোতে বিশেষ কোনো কাজই হয় নি, এমনকি তারা একটি বার্ষিকী প্রকাশ করতে পারে নি। ডাকসুও বের করতে পারেনি একটি বার্ষিকী, যাতে তারা প্রকাশ করতে পারতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার রূপটি। তাহলে কি ধরে নেবো আমাদের ছাত্রদের এখন কোনো সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা নেই? আমি ছাত্রদের সাথে নির্বাচন ও নির্বাচনের সুফল সম্পর্কে আলোচনা ক'রে দেখেছি, তারা খুবই নিস্পৃহ। তাদের কাছে নির্বাচন হচ্ছে নেতা ও কর্মীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ, তাতে কয়েকজন নেতা বেরিয়ে আসে; কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা নির্বাচনের কোনো সুফল ভোগ করে না। গত বছরের নির্বাচন দু-তিনজন নেতা সৃষ্টি করেছে, যাদের নাম এখন সুপরিচিত- এটা তাদের উপকারে আসবে; কিন্তু নির্বাচন সাধারণ ছাত্রদের কিছু দেয় নি। তাদের ছাত্রাবাসের জীবনকে পড়াশুনোর উপযোগী ক'রে তোলে নি, খাবারের উন্নতি সাধন করে নি, পাঠকক্ষে পত্রপত্রিকা বইপত্র সরবরাহ করে নি। একজন সাধারণ ছাত্রের মতে, জাতীয় নির্বাচনে একজন চাষীর যে-ভূমিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে একজন সাধারণ ছাত্রের ভূমিকাও তাই।

ছাত্রনেতাদের বয়সও চোখে পড়ার মতো, তা যেমন কৌতুককর তেমনি ছাত্ররাজনীতির দুর্বলতাসূচক। ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থীদের কেউ কেউ নাকি চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, অনেক দিন ধ'রেই তারা আসলে ছাত্র নয়, তবু তারা ছাত্র। নির্বাচন উপলক্ষে তারা ভর্তি হয়, কোনো একটি বিভাগে তাদের নাম থাকে, কিন্তু তারা কখনো ক্লাশে যায় না। আগে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সটি ছিলো নেতাদের প্রিয়, সেখানে তারা দলবেঁধে ভর্তি হতো। এবার তারা নির্বাচনের আগে ভর্তি হয়েছে পুষ্টি বিজ্ঞানে, যদিও নীতিগতভাবে এমন ভর্তি বৈধ নয়। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ছাত্রদলের পাঁচজনকে অসময়ে ভর্তির অনুমতি দিয়েছে, হয়তো চাপে প'ড়ে দিয়েছে; কিন্তু চাপে প'ড়ে অন্যায় করাও অন্যায়। খবর বেরিয়েছে অবৈধ ভর্তির ফর্ম কালোবাজারে তিন চার হাজার টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে। যারা গণতন্ত্র চায়, সুষ্ঠু সমাজ চায়, তারা এমন একটি অন্যায় করছে ভাবতেও কষ্ট হয়; আর ওই অন্যায়ে অংশ নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, এটা বড়োই বেদনাদায়ক। একটি আদেশ এসেছে যে নির্বাচনের আগে কোনো পরীক্ষার ফল বেরোবে না; কেননা তাতে অনেক নেতা অছাত্র হয়ে পড়বে। এমন একটা আদেশের মুখে আমি পীড়িত বোধ করছি। বহুছাত্র প্রায় বছরখানে ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে ফলের জন্যে, যার অভাবে তারা যোগ দিতে পারছে না কোনো কাজে, তাদের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ; তাদের ফল তৈরি হয়ে পৌঁছে গেছে পরীক্ষানিয়ন্ত্রকের কক্ষে, কিন্তু ওই ফল বেরোবে না। মাত্র কয়েক জনের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিপদে ফেলা হবে বহু ছাত্রকে, যাদের কেউকেউ এ-সিদ্ধান্ত শুনে অশ্রুসংবরণ করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছুই বন্ধ রাখা যেতে পারে, কিন্তু ফল প্রকাশ বন্ধ রাখা যেতে পারে না; এটা তো বিনাঅপরাধে ফল স্থগিত করা। আশা করি

www.BDeBooks.Com

কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সংশোধন করবে। শিক্ষাবর্ষের জটপাকানোর ফলে আমাদের ছাত্রদের বয়স যেমন বেড়ে যায়, তেমনি নির্বাচনজটের জন্যেও নাকি বেড়ে গেছে নেতাদের বয়স। ডাকসুর ভিপি-জিএস এতো প্রবীণ কেনো, আমি জানতে চেয়েছিলাম; একজন ছোটো নেতা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সাময়িক ত্রাতারা আসার পর আট বছর কোনো নির্বাচন হয় নি; মহাবিদ্যালয়ে হয় নি, বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় নি; কিন্তু বছর বছর বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন ছাত্রদলের নেতারা। তারা নিজেদের যৌবন উৎসর্গ করেছে রাজনীতিতে, কিন্তু নির্বাচনে অংশ নেয়ার, নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ পায় নি। ডাকসুতে নির্বাচিত হতে পারলে তাদের রাজনীতিক জীবনটি পাকা হয়ে যায়, দেশব্যাপী সুপরিচিতি লাভ করতে পারে, এবং সেটা খাটিয়ে তারা পরে রাজনীতির সফলতা অর্জন করতে পারে। এখন যারা রাজনীতিকভাবে সফল, যাদের জীবন ক্ষমতা ও সম্পদে পরিপূর্ণ, তাদের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে ডাকসু। ডাকসু ভবিষ্যত রাজনীতিক তৈরি করে; ডাকসুর নেতারা ভবিষ্যতে জননেতা হ'তে পারে, বা নিজেদের বিক্রি ক'রে দিতে পারে কোনো একনায়কের হাটে। আট-নবছর নির্বাচন না হওয়ায় নির্বাচন জট লেগে গেছে, নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে, অনেক নেতা প্রায় পৌঢ় হয়ে উঠেছে। এখানেই নিহিত সম্ভবত এখনকার ছাত্ররাজনীতির দুর্বলতাটি। আসলে ছাত্র নয় এমন বয়স্ক ছাত্ররাজনীতি নানাভাবে রুগ্ন। ছাত্ররা দেখেছে এক স্বপ্ন, নেতারা দেখেছে আরেক স্বপ্ন; এ-দুই স্বপ্নের মিলন ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কোটি টাকার নির্বাচন

এক ছাত্রী অনেক দূর থেকে দৌড়ে এসে বললো, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিয়ে বাড়ি ব'লে মনে হচ্ছে। কয়েক দিন ধ'রে খুব সেজেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কলাভবনের দিকে তাকানো যায় না, কোনো দিকে দেয়াল আর চোখে পড়ে না, দেয়াল হারিয়ে গেছে হাজার হাজার রঙিন পোস্টারের আড়ালে। দিকে দিকে উড়ছে রঙিন ব্যানার। বিশ্ববিদ্যালয় যে বিয়ে বাড়ি হয়ে উঠেছে যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে নি, এটা সুখের; যুদ্ধের থেকে যে বিয়ে অনেক সুখকর তা চিরকুমার সেনাপতিরাও স্বীকার করবেন। নির্বাচন নিয়ে আসে একরাশ ভয়; নির্বাচন ও ত্রাস জমজ ভাইয়ের মতোই হয়ে উঠেছে আমাদের দেশে; কিন্তু এবার ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে এখনো ত্রাসের কোনো আভাস পাওয়া যায় নি। একটি ছাত্রদল কিছুটা উত্তেজনা জাগিয়েছিলো, তবে তা হয়তো এবারের মতো শান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ভবন এখন পোস্টারশোভিত। এবারে নির্বাচন অনেকটা পোস্টারের প্রতিযোগিতা;– পোস্টারে পোস্টারে রঙিন হয়ে আছে কখনো একজনের, কখনো দু'জনের মুখ। সহসভাপতি আর সাধারণ সম্পাদকেরা এসেছে যুগলবন্ধী হয়ে; তাদের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণরা এসেছে অন্যরূপে। রূপের বিচার যদি করি, তাহলে কম গুরুত্বপূর্ণদেরই মনে হয় বেশি আকর্ষণীয়। তাদের চেহারা চমৎকার, পোজও দিয়েছে তারা ভালো, পোস্টারের পেছনে তারা ব্যয়ও করেছে অনেক সময়। যুগল ও একক পোস্টারগুলো দেখে মনে হয় যারা যুগল, অর্থাৎ হতে চায় সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক; তারা চায় নেতৃত্ব, তারা পোস্টারে নিজেদের সুন্দর মুখ দেখানোর জন্যে ব্যগ্র নয়; কিন্তু একক পোস্টারগুলো দেখে মনে হয় এ প্রার্থীরা খুবই আত্মপ্রেমিক, পোস্টার ও দেয়াল ভ'রে তারা দেখতে চায় তাদের মুখ, নানা রঙে। ডাকসুর দু'জন সাহিত্য সম্পাদক ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে; তারা নিজেদের সুশ্রী মুখে ঢেকে ফেলেছে কলাভবনের দেয়াল, যেনো তারা কোনো নির্বাচনে নামে নি নেমেছে সৌন্দর্য ও পোস্টার প্রতিযোগিতায়। তারা যদি হেরেও যায় তবু তারা জিতে যাবে; তাদের মুখ যতোজনের মনে থাকবে এতো আর কারো মুখ মনে থাকবে না। আমি পোস্টারের সাথে সাথে খুঁজছিলাম প্রচারপত্র; জানতে চাইছিলাম বিভিন্ন দলের কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে এমন প্রচারপত্র পাওয়া গেলো না; তাই মনে হয় নির্বাচনের বক্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রচারই গুরুত্বপূর্ণ। এবারের নির্বাচনে অফসেট মুদ্রাযন্ত্রের চরম ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। গত এক সপ্তাহ ধ'রে হয়তো অনেক মুদ্রাযন্ত্র ব্যস্ত ছিলো প্রার্থীদের মুখাবয়ব মুদ্রণে। পোস্টারের প্রাচুর্য দেখে বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রদল খুবই সম্পদশালী, অঢেল অর্থ

www.BDeBooks.Com

রয়েছে তাদের হাতে। ওই অর্থ পোস্টার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। শুধু পোস্টার হয়েই নয়; টাকা ছড়িয়ে পড়েছে কর্মীদের হাতে হাতে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রতিটি সিগারেটের দোকানে এখন পাঁচশো ও একশো টাকার নোটের ভিড়, হাতে হাতে বেনসন, ৫৫৫ ও পাঁচশো টাকার নোট। সিগারেটের দাম বেড়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়; মুদিরা ভাংতি দিতেও হিমশিম খাচ্ছে। এ-নির্বাচন নিশ্চয়ই কোটি টাকার ব্যাপার। আজকাল ইউনিয়ন কাউন্সিলে সদস্য পদে দাঁড়াতে কয়েক লাখ লাগে; উপজেলায় লাগে কোটি টাকা; আর বিশ্ববিদ্যালয়েও সব মিলে কোটি টাকার মতো ব্যয় হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ব্যয়ই হবে তিনলাখ, গত বছর হয়েছিলো ছ লাখ, যদিও অতো ব্যয় হওয়ার কথা ছিলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বছরের নির্বাচন রাজনীতিতে কোনো রেকর্ড সৃষ্টি করবে কিনা জানি না, তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর মাঝেই রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

এ-বছরের [১৯৯০] নির্বাচনটি রেকর্ডসৃষ্টির নির্বাচন। আটত্রিশটির মতো দল নির্বাচনে নেমেছে, এতো দল আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। যে-সব দেশে রাজনীতিকভাবে যতো অনগ্রসর সে-সব দেশে রাজনীতিক দলের সংখ্যা ততো বেশি। কোনো দেশে চারটির বেশি রাজনীতিক দল থাকলে, তা তার রাজনীতিক অস্থিরতাই প্রকাশ করে। আমাদের দেশে দলের শেষ নেই, বিশ্ববিদ্যালয়েও শেষ নেই ছাত্রদলের। ডাকসুতে প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো, চোদ্দটি ছাত্রাবাসে রয়েছে অসংখ্য প্রার্থী, আজ পর্যন্ত অসংখ্যই; কেননা নির্বাচনের সাথে জড়িতরাও প্রার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা জানেন না। এ-বছর যে-ভোটপত্র ছাপা হবে, তা হবে বিশ্বের দীর্ঘতম ভোটপত্র, যাকে গিনিসের বিশ্বরেকর্ডপুস্তকে স্থান দিতেই হবে। ডাকসুর ভোটপত্র হবে বিশ পাতার মতো, ছাত্রাবাসগুলোর ভোটপত্র হবে ছ-সাত পৃষ্ঠা। ছাত্রছাত্রীরা কি ঠিকমতো ভোট দিতে পারবে? ভোটদাতারা ভোটপত্রে প্রার্থীদের নামের পাশে ক্রস চিহ্ন দেবে, বলপয়েন্টে; আমি নিশ্চিত শতকরা বিশজন ঠিকমতো ক্রস দিতে পারবে না। অতো বড়ো ভোটপত্র নিয়েই মুশকিলে পড়বে, প্যানেল অনুযায়ী নাম খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাবে, ক্রস দিতে গিয়ে টিক দেবে; একজনের নামের পাশে ক্রস দিতে গিয়ে ক্রস দেবে আরেকের নামের পাশে। অনেক ভোট বাতিল হবে, নাকি দয়া ক'রে বাতিল করা হবে না? বাঙালি ঠিক জায়গায় ক্রস দিতে অভ্যস্ত নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা ছোটো ভোটপত্রে ক্রস দিতে গিয়ে টিক দেন, ঘষাঘষি করেন, ক্রস ছড়িয়ে পড়ে একাধিক নামের ঘরে; তাদের ছাত্ররা কি অতো বড়ো ভোটপত্রকে বশে রাখতে পারবে?

ভোটদাতারা ভোট দেয়ার নামে একটি ভালো পরীক্ষা দেবে। ভোট গোনাও হবে একটা রেকর্ড। শিক্ষকেরা কলাভবনের চারতলায় বিকেল ছ'টায় গুনতে বসবেন, কখন যে শেষ করে উঠবেন, তা কেউ জানে না। এবার অবশ্য ত্রাসের মধ্যে কাজ করতে হবে না তাদের; ভয়ে থাকবেন না যে এই বুঝি অস্ত্রীরা এলো, ছিনিয়ে নিলো সোনার ধান। ভোট উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে চার দিন; আর আগের এক সপ্তাহ ভ'রে ক্লাশে কোনো কথাই বলা যায়নি। নির্বাচনী প্রচারে মুখর থেকেছে বিশ্ববিদ্যালয়, অজস্র মাইক্রোফোন ব্যস্ত থেকেছে; ক্লাশে শিক্ষকের স্বর হারিয়ে গেছে। দেশের রাজনীতি

যখন নিস্তব্ধ, দেশের রাজনীতিক বাজারে যখন চলছে নতুন নতুন বোঝাপড়া, যখন স্বৈরাচার সহ্য হয়ে গেছে জনগণের, বিশেষ ক'রে রাজনীতি ব্যবসায়ীদের, যখন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা আত্মসমর্পণ করছে একনায়কদের পায়ে, তখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র; যখন সারাদেশে চলে অবাধ একনায়কত্ব, তখনো কিছুটা গণতন্ত্র কিছুটা প্রগতিশীলতা কিছুটা স্বাধীনতা টিকে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাঙলাদেশ সৃষ্টি ও স্বাধীনতার মূলেই রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু গত কয়েক বছর ধ'রে ছাত্র রাজনীতিও অনেকটা পথ হারিয়ে ফেলেছে, যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়েছিলো বর্তমান স্বৈরাচারের রিরুদ্ধে, প্রথম রক্তও দিয়েছিলো তারাই। ডাকসুকে মঞ্চ ক'রে অনেকে সাফল্য অর্জন করেছে দালালিতে। দেশের রাজনীতিতে এখন অশুভ গ্রহের মতো বিরাজ করছে যারা, সব আদর্শের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা এক সময় ছিলো ডাকসুর মঞ্চের ওপরই। এ-মঞ্চ থেকেই তারা উঠে গেছে গণবিরোধিতার মঞ্চে। কোটি টাকার নির্বাচনে যারা অংশ নিচ্ছে, যারা জয়ী হবে, তারা কি অনুসরণ করবে তাদের পূর্বগামীদের কুখ্যাত পথ, নাকি তারা সত্যি চায় দেশের মঙ্গল? নির্বাচনী প্রচারে যে সচ্ছলতা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় তারা কোথাও বন্দী, বন্দিত্বের বিনিময়ে তারা পেয়েছে সচ্ছলতা; এবং পরে শক্তি ও সচ্ছলতার জন্যে তারা হয়ে পড়বে পুরোপুরি বন্দি। গরিব দেশে কোটি টাকার নির্বাচন আশান্বিত না ক'রে আতংকিত ক'রে, যারা নিজেদের মুখাবয়ব নিয়ে ব্যস্ত তারা সাধারণ মানুষের মুখ বেশি দিন মনে রাখতে পারবে না।

www.BDeBooks.Com

দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ

ডেইজিকে, কালিগঞ্জের ও বাংলাদেশের ঘন কালিমার মাঝে যে এক টুকরো সুন্দর হয়ে পনেরো ষোলো বছর বেঁচে ছিলো, যে-সুন্দরকে পিশাচেরা মুছে দিয়েছে জীবন থেকে, যাকে আমি কোন দিন দেখিনি ব'লে জীবনে একটি বড়ো শূন্যতা থেকে যাবে, যার ছবি দেখেছি আমি নিউজপ্রিন্টে, যার মুখ নোংরা নিউজপ্রিন্টকেও ক'রে তুলেছে সুন্দর, সে আমার ভিতরে একটি বিশাল অশ্রুবিন্দুর মতো টলমল করে। সে যে জন্মেছিলো ভয়াবহ বাঙলায়, তার জন্য এ-মাটি তার কাছে ঋণী। সে হ'তে পারতো আমারও কন্যা, সুখী করতে পারতো আমাকেও। দেখতে পাই ডেইজি তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ইস্কুলে যাচ্ছে চারপাশের ময়লাকে পবিত্র সুন্দর ক'রে। দেখতে পাই সে তার ছোট্ট টেবিলে ব'সে পড়ছে, মেধা ও সৌন্দর্য জড়ো হয়েছে ছোট্ট বেড়ার ঘরে। সে-ডেইজিকে আর কোন দিন দেখতে পাবে না। তার পিতা হয়তো ভুল ক'রে দেখবে ডেইজি দাঁড়িয়ে আছে ঘাছের ছায়ায়, হঠাৎ হয়তো শুনবে ডেইজি তাকে ডাকছে 'আব্বা' ব'লে, হয়তো নিঝেই ডেইজিকে ডাকবে নাম ধ'রে। কেউ সাড়া দেবে না। পিশাচের লালসা পৃথিবী থেকে অনুপস্থিত ক'রে দিয়েছে ডেইজিকে। বাঙলা এখন পৃথিবীর নৃশংসতম দেশ। অপমৃত্যু এখানে রীতি; লালসা এখানে কয়লার মতো জ্বলে। দেশ জুড়ে প্রতিটি ডেইজির পেছনে পেছনে ঘোরে অসংখ্য লালসা, প্রতিটি সুন্দরকে নোংরা ক'রে দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে অসংখ্য পিশাচ। ডেইজির দুটি অপরাধ ছিলো—সে মেয়ে ছিল, আর সুন্দর ছিলো। মেয়ে হিশেবেই তার জীবনে কোনো সময় হয়তো ঘটতো কোনো দুর্ঘটনা, আর সুন্দর হওয়া ছিলো তার জন্মগত অপরাধ। সুন্দরের জন্যে রাহুদের ক্ষুধা থাকে প্রচণ্ড। ডেইজি সে-রাহুরই ক্ষুধার শিকার। বাঙলা নষ্ট হয়ে গেছে, তার সমস্ত সুন্দর আবেগও পরিণত হয়েছে পাশবিকতায়। এখন আর কেউ এখানে প্রেমে পড়ে না, উত্তেজিত হয় মাংসের ক্ষুধায়, আর ওই ক্ষুধাকে মনে ক'রে প্রেম। ডেইজির মতো সৌন্দর্য অবশ্যই আকর্ষণ করবে অনেককে, অনেকেই স্বপ্ন দেখবে ওই সুন্দরকে, তার প্রেমেও পড়বে অনেকে, এটা খুব স্বাভাবিক। ওই সুন্দরকে স্বপ্ন দেখবে, তার জন্য আবেগ অনুভব করা, তাকে ভালোবাসাই তো একটা সুখ। কিন্তু এ-সুখে আর পাশব বাঙলা সুখ পায় না, সুন্দরকে বলাৎকার করতে না পারলে বাঙলার কামের পরিতৃপ্তি নেই। কেউ এখন আর ব্যর্থতা ব'লে কিছু মেনে নিতে রাজি নয়; কারণ মানুষই ব্যর্থ হয়, দানবের অভিধানে ব্যর্থতা ব'লে কিছু নেই। ব্যর্থতা এখানে সাফল্য অর্জন করে প্রতিহিংসায়, যার রূপ বিভিন্ন। ব্যর্থ কাম এখানে ধর্ষণ করে, খুন করে, অ্যাসিড ছোঁড়ে, আর অপার্থিবার শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ডেইজি ভোরবেলা ঘরের বাইরে গেলে, সেখানে ওত পেতে ছিলো বর্তমান বাঙলার বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরা, যারা দিকে দিকে বাস্তবায়িত ক'রে চলেছে তাদের বীভৎস স্বপ্ন, তারা তাকে ধ'রে সারা শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বেলে দেয়। ডেইজির গায়ে আগুন লাগিয়েছে কুৎসিত পিশাচেরা; তারা শুধু কুৎসিত মানুষ নয়, তারা বর্তমানে সমাজ ও রাজনীতির মনুষ্যরূপ। এ-সমাজরাজনীতি তাদের শিখিয়েছে ব্যর্থ হ'লে খুন করতে হবে, তারা জানে যে খুন করা হ'লে তাদের কিছু হবে না। কতো ডেইজি প্রাণ দিয়েছে গত দশ বছরে, কোনো হিশেব নেই তার; ডেইজির চ;লে যাওয়ার পরেও যে ক-জন ডেইজি, সারা বাঙলায়, লোমশ পিশাচদের খাদ্য হয়েছে, জানে না তাও কেউ। পিশাচসমাজে পিশাচদের কিছু হয় না; তাদের শাস্তির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। সারা দেশে গ'ড়ে তোলা হয়েছে পৈশাচিক পরিবেশ, তাতে খুব সুখশান্তিতে নিশ্বাস নেয় ঘাতকেরা; কিন্তু ডেইজিরা তাদের ক্ষুধায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়, তাদের ছুরিকায় টুকরো হয়, তাদের ছাড়ানো পেট্রোলের আগুনে ভস্ম হয়। সৌন্দর্য নিহত হয়, বেঁচে থাকে ঘাতক হাবশিরা। বাঙলায় এখন হাবশিদের রাজত্ব চলছে।

ডেইজিকে যারা পুড়িয়ে নৃশংসভাবে মেরেছে, কী শাস্তি হবে তাদের? কোনো শাস্তি হবে? কী শাস্তি হবে? চার বছর কারাবাস? তারপর বেরিয়ে এসে আবার কোনো সুন্দরের শরীরে আগুন জ্বালাবে। দশ বছর কারাবাস হবে? তারপর বেরিয়ে এসে আগুনে পোড়াবে নতুন কোনো সুন্দরের টুকরোকে? মৃত্যুদণ্ড হবে? ঝোলানো হবে ফাঁসিতে? বসানো হবে বৈদ্যুতিক চেয়ারে? মনে করা যাক ফাঁসি হবে তাদের; কিন্তু ফাঁসি কি তাদের জন্য যথেষ্ট? আমি আমার কন্যার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ডেইজির ঘাতদের কী শাস্তি তুমি চাও? তার কাছে জানতে চেয়েছি, কারণ আর দু-তিন বছর পর সে হয়ে উঠবে ডেইজির বয়সের, আর এখন থেকেই সে বাস করছে পিশাচপরিবৃত সমাজের আতঙ্কের মধ্যে। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কি তাদের ফাঁসি চাও, তাদের গুলি ক'রে মারা হোক তা চাও? সে উত্তর দিয়েছে, আমি চাই ডেইজির শরীর যেমন পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগানো হয়েছে, তাদের শরীরেও তেমনি পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগানো হোক। তার উত্তর শুনে আমি শিউরে উঠছি, ভয় পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, কিন্তু আমার কন্যা যে-শাস্তি বিধান করেছে ডেইজির ঘাতকদের, তাকেই মনে হচ্ছে যথোচিত। আমার মনে হয়েছে, আমর কন্যার রায় শুনে, তার মুখ দিয়ে ডেইজিই কথা বলেছে। ডেইজির যন্ত্রণা বুঝতে পারে আরেক ডেইজি, নিহত ডেইজি কথা বলে এখনো-বেঁচে-থাকা আরেক ডেইজির কণ্ঠে। আমার কন্যা এখনো বাইবেল পড়ে নি, কিন্তু তার মুখে উচ্চারিত হয়েছে পুরোনো বাইবেলের বিধান-দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, পেট্রোল ছড়িয়ে পোড়ানোর বদলে পেট্রোল ছড়িয়ে পোড়ানো। কেনো এ-শাস্তি উচ্চারিত হলো তার কণ্ঠে, যেমন কয়েক হাজার বছর আগে উচ্চারিত হয়েছিলো কোনো সেমেটীয় প্রেরিত পুরুষের কণ্ঠে? পুরস্কার ও শাস্তি দু-ই হয়ে থাকে সময় অনুসারে; বিশশতকে শাস্তি বিশশতক অনুসারী, খ্রিস্টপূর্বাব্দের শাস্তি খ্রিস্টপূর্বাব্দ অনুসারী। তাহলে কি আমার কন্যা আর বাইবেলের প্রেরিত পুরুষ একই সময়ের ও সমাজের অধিবাসী; আর তারা দুজনেই দেখছে একই

www.BDeBooks.Com

দৃশ্য, একই পাশবিকতা? চোখের বদলে চোখ ছিঁড়ে নিতে হবে, দাঁতের বদলে তুলে নিতে হবে দাঁত, এ-বিধানকে বিশশতকের চোখে নৃশংস মনে হবে; কিন্তু বাইবেলের মহাপুরুষকে ওই বিধানই দিতে হয়েছিলো, হয়তো তা ছিলো ওই সময়ের জন্যে পুরোপুরি মানবিক। ইসলামের যে-শাস্তির বিধান রয়েছে, আজকের চোখে তার কোনো কোনোটিকে খুবই কঠোর মনে হয়, কিন্তু তখনকার আরবের জন্যে ওই বিধান ছিলো সমুচিত। আরবে তখন চলছিলো যে-অন্ধকার যুগ, যেখানে নৃশংসতা পাশবিকতা ছিলো প্রাত্যহিক ব্যাপার, সেখারে ওই বিধানই শুধু ভীত করতে পারতো সম্ভাব্য অপরাধীদের। মানবিকতা থেকে তাদের কিছু শেখার শক্তি ছিলো না, তারা শিখতে পারতো শুধু নৃশংসতা থেকে;—যখন দেখতো কাউকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিহত করা হচ্ছে, তখন নিজের ওই পরিণতির কথা ভেবে সে বিরত থাকতে বাধ্য হতো ওই অপরাধ থেকে। মানুষের জন্য দরকার মানবিক শাস্তি; আর পিশাচের জন্যে দরকার পৈশাচিক শাস্তি। বাঙলার সমাজের দিকে তাকালে মনে হয় পুরোনো বাইবেলের কাল ভয়ংকরভাবে বয়ে চলছে, সেখানে লঘুদণ্ড অপরাধ। এ-সময়ে এ-সমাজে এক গালে কেউ চড় দিলে আরেক গাল পেতে দেয়ার কথাই ওঠে না, কারণ এটা চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁতের কাল। একটি ক্ষেত্রে অন্তত আমার কন্যার রায় আমি বাস্তবায়িত দেখতে চাই; ডেইজির ঘাতকদের যেনো নিহত করা হয় অবিকল সেভাবে, যেভাবে তারা মুছে দেয় ডেইজিদের। ডেইজি আর ফিরে আসবে না; কিন্তু পুরোনো বাইবেলের এ-ভয়ংকর সমাজে যদি বিধান করা হয় এ-সমাজের উপযুক্ত শাস্তি, তাহলে ডেইজিদের দিকে হাত বাড়ানোর আগে শরীরটা কেঁপে উঠবে পিশাচদের।

একটি একাডেমির পতন ও প্রতিক্রিয়াশীলতা

বাঙালিকে একটি একাডেমি দাও, বাঙালি সেটিকে গোয়ালে পরিণত করবে। বাঙালি একটি একাডেমি সৃষ্টি করেছিলো, সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তাজা রক্তের ভিত্তির ওপর, তাকে নাম দিয়েছিলো 'বাঙলা একাডেমি'; এবং সাড়ে তিন দশকেই বাঙালি তাকে উপযুক্ত ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছে। প্লাতো একটি গরিব উদ্যানকে ক'রে তুলেছিলেন একাডেমির-অজর জ্ঞানকেন্দ্রে; আর বাঙালিরা একটি একাডেমিকে রূপান্তরিত করেছে গোশালে। একাডেমির আত্মা হচ্ছে জ্ঞান; তবে ওই জ্ঞানকেই সযত্নে পরিহার ক'রে চলছে বাঙালির প্রিয় একাডেমিটি। অট্টালিকা একাডেমি নয়, আসবাবপত্র একাডেমি নয়; যেখানে জ্ঞানের চর্চা হয়, তাই একাডেমি; আজ্ঞাবহ একাডেমি নয়, কর্মকর্তা একাডেমি নয়, মহাপরিচালক একাডেমি নয়; কিন্তু বাঙলা একাডেমি হয়ে উঠেছে অট্টালিকা, আসবাবপত্র ও মহাপরিচালকের সমষ্টি। আমলার পর আমলারা দখল করেছে এটি, অধ্যাপকের বেশে এটিকে দখল করেছে ব্যর্থ আমলারা; তারা শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেছে, গাড়ি চড়েছে, মধ্যশূন্য টেবিলে ব'সে বৈঠক করছে, চাকরিতে থাকার জন্য হৃদপিণ্ড জীর্ণ ক'রে তোষামোদ করেছে বড়ো আমলা ও শক্তিমানদের; এবং এর আত্মাটিকে বিনামূল্যে বিক্রি ক'রে দিয়েছে। বড়ো কোনো পরিকল্পনা তাদের মাথায় আসে নি; মহৎ কোনো স্বপ্ন তাদের বুকে জন্ম নেয় নি। একাডেমি হয়ে উঠেছে ব্যাংকের মতো ঝকঝকে; তবে তার অন্তর্কোষে জ্ঞানের স্বর্ণমুদ্রা জমে নি; বরং দিন দিন দেউলে হয়ে উঠেছে। একাডেমি কোনো পণ্ডিত সৃষ্টি করে নি, তবে সম্ভাব্য পণ্ডিতদের পরিণত করেছে অনুগত দাসে। একাডেমির দিকে তাকালে কিছুতেই মনে হয় না এখানে জ্ঞান চর্চা হয়, বা এখানে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা হয় জ্ঞানচর্চার; মনে হয় এখানে নানা ঝকঝকে পদে নানাব্যক্তি রয়েছেন; এবং এখানে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় পদ, যার জন্যে দু-তিন বছর পর পর বিভিন্নজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় দিকে দিকে। কিছুদিন পাগলের মতো প্রমত্ত থাকে ব্যর্থ আমলারা; একদিন অনেকের দীর্ঘশ্বাসের ওপর দিয়ে আসে একটি অনুগত ভৃত্য। একটি একাডেমির প্রধানের যে 'মহাপরিচালক' এটাই হাস্যকর ও অন্ত:সারশূন্যতার পরিচায়ক; ওই পদ যিনি অলংকৃত করেন তাঁকে আমলা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, পণ্ডিত তো নয়ই। তাই হয়েছে বারবার। শক্তিমানদের অনুগত ও আত্মীয় যাঁরা এটিকে শোভিত ক'রে আসছেন প্রায় একদশক ধ'রে তাঁরা কেউ পণ্ডিত নন; একটি ভালো বই

www.BDeBooks.Com

তাঁরা কেউ লেখেন নি; এমনকি বাঙলা একাডেমির যে একটি সুলভ সাহিত্য পুরস্কার রয়েছে, সেটি পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা তাঁদের এ-জীবনে নেই। কিন্তু তাঁরা দখল করেছেন একাডেমি; যাঁদের যাওয়ার কথা ছিলো মৎস্য, গো বা সার-উন্নয়ন জাতীয় সংস্থায়, তাঁরা এসেছেন জ্ঞানকেন্দ্রে, যে জ্ঞানের তাদের দূরতম সম্পর্ক। এর ফল অশুভ না হয়ে পারে না, হয়েছে তাই; বাঙলা একাডেমি পরিণত হয়েছে একটি পঙ্গু প্রতিষ্ঠানে, যার কাছে সামান্য আশাও দুরাশার মতো মনে হয়। সৃষ্টিশীলতাকে এটি শুরু থেকেই উপেক্ষা করেছে; আর যে-মননের এলাকাটি বেছে নিয়েছে একাডেমি নিজের ক্ষেত্র ব'লে, সেটিকেও ক'রে তুলেছে মরুভূমির মতো অনুর্বর। পৃথিবীর প্রধান একাডেমিগুলো প্রকাশ করেছে আপন ভাষার বিশ্বস্ত অভিধান, যে-অভিধানকে গণ্য করা হয় ওই জাতির কীর্তি ব'লে, কিন্তু আমাদের প্রিয় একাডেমি প্রকাশ করেছে একটি নকল অভিধান। এতো দিনে একাডেমি বাঙলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনারও পরিকল্পনা নিতে পারে নি। প্রকাশ করেছে অসংখ্য ভুলে পরিপূর্ণ বই, যা শোচনীয়ভাবে মর্মস্পর্শী।

বাঙলা একাডেমির জন্ম হয়েছিলো প্রগতিশীলতা থেকে; কিন্তু এটি ক্রমশ হয়ে উঠেছে প্রগতিবিমুখ বা প্রতিক্রিয়াশীল। পাকিস্তান পর্বেই শুরু হয়েছিলো এ-প্রক্রিয়া; এবং তা এতো মারাত্মক হয়ে উঠেছিলো যে জনতাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিলো। এক প্রতিক্রিয়াশীল পরিচালক ৬৯-এ দেয়াল টপকে নিজেকে বাঁচিয়েছিলেন। এখন ওই প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরের একাডেমির অনুষ্ঠানপত্রগুলো দেখলে বোঝা যায় একাডেমি কী চমৎকারভাবে অংশগ্রহণকারী হিশেবে বেছে নিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের, প্রিয়জনদের ও একান্ত বাধ্যদের। যিনি যা জানে না না, বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি সে-বিষয়ে; যিনি কোনোদিন ভালোভাবে জানবেন না, তিনি বই লিখেছেন সে-বিষয়ে। সৃষ্টিশীল লেখকদের একাডেমি সাধারণত অস্পৃশ্য গণ্য করে , তাঁদের ডাকে না; এমনকি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানেও একটি কথা বলারও সুযোগ দেয় না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফিরে ফিরে আসে বান্ধবেরা; বাঙলা একাডেমির চিত্রপ্রদর্শনীতে শোভা পায় কর্মকর্তাদের ও প্রিয়জনদের ছবি। এবার একুশের উৎসব উদ্বোধন করানো হয়েছে এমন একজনকে দিকে যাঁকে ছাত্ররা অভিহিত করেছে 'চিহ্নিত রাজাকার' হিশেবে। গত কয়েক বছরে রাজাকারদের স্বর্ণযুগে ওই ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে; হঠাৎ শুনতে পাচ্ছি তিনি নাকি দার্শনিক চিন্তাবিদ। কোনোকালে তিনি কিছু অপাঠ্য পুস্তিকা লিখেছিলেন, তাতে অনেক বাজে কথা আছে ব'লে দার্শনিক চিন্তাবিদ হয়ে উঠেছেন তিনি। বাঙলা একাডেমি এবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আরো একডজন প্রগতিবিমুখকে, যাতে প্রগতিশীলতা থেকে যে-একাডেমির সৃষ্টি হয়েছিলো, তাকে পুরোপুরি দুশ্চরিত্র ক'রে তোলা যায়। একরাশ ছদ্মপ্রগতিশীলও ছিলেন, যাঁরা শহীদ মিনারকে মাতিয়ে রাখেন তাঁরাও যোগ দিয়েছেন রাজাকার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে। ছদ্মপ্রগতিশীলেরা এখন একটি বড়ো সমস্যা, তাঁদের প্রতারণায় দেশ ও জাতি কেবলই পিছু হটছে। ছদ্মপ্রগতিশীলদের খুব প্রিয় জায়গা মঞ্চ-মঞ্চ পেলে তাঁরা শয্যাকেও বিদায় জানান; সমস্ত বাছবিচার ভুলে যান। প্রতিক্রিয়াশীল ও ভুঁয়ো

প্রগতিশীল উভয় গোত্রের হাত থেকেই একাডেমিকে বাঁচানো এখন ছাত্র ও প্রতারিত জনতার কর্তব্য। একজন গায়ক এসেছিলেন এবার প্রতিক্রিয়াশীলতার চারণরূপে, গলা ফুলিয়ে তিনি বদনাম করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্রদের, বিষকে তিনি উপভোগ্য করে তোলার চেষ্ট করেছিলেন। ওই গায়ক তাঁর গলা ফোলানোর জন্যে আর বিষ পান না? তাঁর গলায় কেনো ওঠে না অবৈধ সংসদের গান, ভোট ডাকাতির গীতিকা, দেশজুড়ে পিশাচদের ঘুষের গজল? ওঠে না; কেননা তিনি তাঁর আত্মাটিকে পিশাচদের কাছে শস্তায় বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। ওই যে গানটি বিপথগামী গায়কের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিলো, তা কি শুধু ওই গায়কেরই কণ্ঠস্বর? ওই কণ্ঠস্বরটি আসলে প্রগতিবিমুখ রাষ্ট্রযন্ত্রের আর বাঙলা একাডেমির। বাঙলা একাডেমির প্রতিক্রিয়াশীলতা ভালোভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে একাডেমির সংকলিত ও প্রকাশিত চরিতাভিধান-এ।
চরিতাভিধানটিতে প্রগতিবিরোধীদের জীবনী ছাপা হয়েছে বড়ো ক'রে, তাদের অপরাধ চেপে যাওয়া হয়েছে; রাজাকারদের বলা হয় নি রাজাকার। ওই চরিতাভিধান প'ড়ে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের পার্থক্য বোঝা যায় না, রাজাকারদেরই মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো একাডেমির আরো অনেক পুস্তকে গোপনে ঘটানো হয়েছে এমন অপরাধ। একাডেমির এবারের উৎসবের দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে হয়েছে ছাত্রদের, হয়তো অচিরেই পুরো একাডেমির দায়িত্বই নিতে হবে তাদের। একাডেমি পরিচালনার জন্য-পর্ষদটি রয়েছে, তা পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল। অনেক বছর ধ'রে একাডেমিতে কোনো নির্বাচন হয় না, তাই পর্ষদ উপচে পড়েছে সরকারি ও সরকার অনুগত প্রগতিবিমুখ সদস্যে, যারা প্রতিনিয়ত চক্রান্ত ক'রে চলছে প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে। একটি অধ:পতিত ও প্রতিক্রিয়াশীল একাডেমি থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। তবে বাঙলা অনেক রক্তে সৃষ্টিকরে ছিলো এটিকে; এখন এটিকে উদ্ধার করতে হবে বাঙালিকেই—এখনি।

www.BDeBooks.Com

মধ্যপ্রাচ্যেই হবে পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা?

আমি মনে করি না যে পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি এসে গেছে; মনে করি না যে এ-শতকে, বা আগামী শতকে, বা কোটি বছরে ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষের সুন্দর পৃথিবী। পৃথিবীতে অবশ্য বৈনাশিক ভবিষ্যৎ বক্তার অভাব কখনো হয় নি; জিসাসের জন্মের অনেক আগেও অনেক ভবিষ্যৎবক্তা জন্মেছেন যাঁরা রটিয়ে গেছেন যে পৃথিবীর দিন ঘনিয়ে এসেছে-দু-তিন দশকের মধ্যেই দু:খীমাটির টুকরোটি অনন্ত শূন্যতায় মিশে যাবে। তবে এখনো এটি বেঁচে আছে; বেঁচে থাকবে আরো অনেক কোটি বছর, যদিও তার ওপর দিয়ে বহু ঝড় বয়ে যাবে। মানুষ প্রজাতিটি যদিও আমার খুবই প্রিয় তবু এর সম্পর্কে আমি নানা সন্দেহ পোষণ করি। মানুষের আচরণ দেখে আমার মনে হয় মানুষ একটি মিশ্র প্রজাতি; অন্য প্রাণীরা অমিশ্র ও বিশুদ্ধ। একটি পায়রা সব সময়ই পায়রা; একটি বাঘ সব সময়ই বাঘ; একটি গোখরো সব সময়ই গোখরো; কিন্তু মানুষ সব সময় মানুষ নয়। পায়রার গর্ভে সব সময়ই পায়রা জন্মে; পায়রার ডিম ফেটে কখনো বিষাক্ত গোখরো বেরোয় না। বাঘের পেটে সব সময়ই হিংস্র বাঘ জন্ম নেয়, বাঘের পেটে কখনো স্বপ্নের মতো পায়রা জন্মে না। গোখরো সব সময়ই জন্ম দেয় বিষাক্ত গোখরো। মানুষ অন্যরকম। মানুষের পেটে সব সময় মানুষ জন্মে না। মানুষের পেটে জন্ম নিতে পারে ভোরের কবুতর; মানুষের পেটে জন্ম নিয়ে থাকে সুন্দরবনের বাঘের থেকেও হিংস্র বাঘ; মানুষের জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বিষাক্ত গোখরোর থেকেও বিষাক্ত গোখরো। মানুষের ইতিহাসে জঘন্য বাঘের জন্ম কম হয় নি; গোখরোও মানুষ কম জন্ম দেয় নি। মানুষের মাঝে জন্ম নিয়েছে অজস্র দানব; মানুষের রূপ ধ'রে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য শয়তান। আর এটাই পীড়াদায়ক যে মানুষকে সাধারণত শাসন করে ওই বন্য বাঘেরা বিষাক্ত গোখরোরা; প্রাগৈতিহাসিক দানবের, পাপিষ্ঠ শয়তানেরা। তাদের জন্য মানুষের সভ্যতা বারবার বিপন্ন হয়েছে, মানুষের রক্তে ও আর্তনাদে তারা ছোটো পৃথিবীকে ভ'রে ফেলেছে। মানুষের পেটে জন্ম নেয়া একটা গোখরো মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে; তাতে প্রাণ হারাতে পারে কোটিকোটি মানুষ। মানুষ অনেক মধ্যযুগ, রক্তপাতের অনেক বীভৎসতা দেখেছে; রক্তপাতে মাটি কখনো পবিত্র হয় না, রক্তে মাটি মলিন হয়। যুদ্ধ বাধায় শয়তানেরা, প্রাণ দেয় নিরীহরা। নষ্ট বুড়োরাও যুদ্ধ লাগিয়ে সুখ পায়, শক্তি অনুভব করে; তাতে শরীর ও প্রাণ উৎসর্গ করতে বাধ্য হয় নিষ্পাপ তরুণেরা। প্রথম মহাযুদ্ধে তরুণদের লাশে ট্রেঞ্চ ভ'রে গেছে, দিতীয় মহাযুদ্ধে তরুণদের লাশও খুঁজে পাওয়া যায় নি।আরেকটি মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমরা বাস করছি। যুদ্ধের চরিত্রও বদলে গেছে ; আজ যদি কোনো মহাযুদ্ধ হয়, তবে

তা এক বাহিনীর বিরুদ্ধে আরেক বাহিনীর যুদ্ধ হবে না; সে-যুদ্ধ হবে সমগ্র মানব জাতি ও ছোটো গ্রহটিরই বিরুদ্ধে। মানুষের বিজ্ঞান ধ্বংসের প্রণালি আবিষ্কারে যতোটা ব্যয় করেছে প্রতিভা, ততোটা শুভবোধ নিয়োগ করে নি সৃষ্টির কাজে। কয়েকটি রাষ্ট্র আজ ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী যা পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করতে সমর্থ। এখন যে-কোনো স্থান থেকে যে-কোনো স্থানের ওপর সর্বধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব; ধ্বংস ক'রে ফেলা সম্ভব মানুষ ও তার সভ্যতা। অনেক উন্মাদের হাতে এখন আণবিক বোমা; বহু গোখরোর মুখে এখন সারিসারি পারমাণবিক দাঁত। উন্মাদ আর গোখরোরা মানুষ বোঝে না, সভ্যতা বোঝে না; উন্মত্ততায় তারা সুখ পায়, ছোবল তাদের পরিতৃপ্ত করে। তাই এখন মহাযুদ্ধ বাধার অর্থ হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীকে উন্মাদের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করা। কয়েক দিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পৃথিবী, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে মানুষ ও তার সভ্যতা। পঞ্চাশের দশকে সম্ভাব্য মহাযুদ্ধের আতংকের মধ্যে মানুষের সময় কেটেছে; তারপর ধীরে ধীরে আতংক কমেছে। মহাযুদ্ধ যে একটা মহাজাগতিক উন্মত্ততা হবে, এটা বুঝেছে সব মহাশক্তি; কেননা সে-যুদ্ধে কেউ জয়ী হবে না, জয় হবে শুধু ধ্বংসের। আরেকটি মহাযুদ্ধ—একটা পারমাণবিক মহাযুদ্ধ সহ্য করার শক্তি নেই ছোটো গ্রহটির। আরেকটি মহাযুদ্ধের অর্থ হচ্ছে চরম অন্ধকার।

কিন্তু পৃথিবীর চরম অন্ধকারের সূচনা কি হবে মধ্যপ্রাচ্যেই? মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি হানাহানির জন্য বিখ্যাত; আর ওই মরুভূমিতেই কালে কালে আবির্ভূত হয়েছেন প্রেরিতপুরুষেরা নানা ঐশী গ্রন্থ নিয়ে। ওই সব গ্রন্থে মানুষের জীবনের কথা আছে, তার বিনাশের কথাও ভয়ংকরভাবে আছে। ওই এলাকাটিকে নিয়তির নিজস্ব এলাকা ব'লেই মনে হয়; আর আধুনিক বিশ্বে ওই এলাকার মানুষেরাই সবচেয়ে নিয়তিবাদী। এককালে অত্যন্ত অনুন্নত, ও এখন নিয়তির কৃপায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য খুব শান্তির এলাকা নয়। আরবের বালুকারাশি যতোদূর ছড়িয়ে আছে, ততোদূর ছড়িয়ে আছে মধ্যযুগ। ওই বালুকার প্রতিটি কণা আধুনিকতা ও প্রগতিবিরোধী। তারা কোনো মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তারা তাদের ধর্মের মূলবাণীকেও গ্রহণ করে নি, যদিও ধর্মতন্ত্রের সেখানে একাধিপত্য। ওই এলাকা শাসন করে বিভিন্ন পরিবার—তারা রাজা বা আমির; এবং স্বৈরাচারী একনায়ক। মানুষের সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, রাজনীতিক অধিকার নেই। নারীদের তো সেখানে কামনাপরিতৃপ্তির ভূমিকা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই। সেখানে শাসকবদল ঘটে সাধারণত রক্তের প্রবাহে। যুদ্ধকে তারা আজো মধ্যযুগীয় উদ্দীপনার সাথেই গ্রহণ করে। পাশাপাশি দুটি দেশ আট বছর যুদ্ধ করেছে; লাভ হওয়ার কোনো কথাই ওঠে না, কোনো লাভ হয় নি। জনগণ যেহেতু সেখানে শাসকদের দাস, তাই তারা কোনো প্রশ্নও করতে পারে নি। এখন যে-অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে, তাতে একটা বড়ো রকমের যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা বেশ স্পষ্ট। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশের শাসকদের প্রহরী-নিজেরই স্বার্থে। আমেরিকা ও তার মিত্ররা একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে; সৌদি আরবের পবিত্র মাটি এর মাঝেই মার্কিন সৈনিকদের বুটের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। যে-দেশে আরব্য রজনীর বার্টনকে ঢুকতে হয়েছিলো বেদুইনের ছদ্মবেশে, সে-

www.BDeBooks.Com

দেশে সৈনিকবেশে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে মার্কিন সৈন্যরা, এ নিয়তির এক চরম পরিহাস। এতে যদি সৌদি আরবের কিছুটা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে-যুদ্ধ চরম সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে: বোরখার ভেতর থেকে মেয়েদের নিয়ে আসতে পারে পানশালায়-তবে তাকে একটি বড়ো ঘটনা ব'লেই গণ্য করতে হবে। ইরাক প্রথমে আক্রমণ করেছে, এখন আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। ইরাক বিদেশিদের পণবন্দিরূপে ব্যবহার করছে, এমন সব হুমকি দিচ্ছে যাকে সভ্যতার প্রকাশ বলা যায়না। ইরাক হুমকি দিয়েছে আক্রান্ত হ'লে সে পৃথিবীর যে-কোনো স্থানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র ফেলবে; অর্থাৎ ইরাক সারা পৃথিবী—একটি সম্পূর্ণ গ্রহকে—পণবন্দিতে পরিণত করেছে। যুদ্ধ বাধলে ইরাক কি সত্যই ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়বে ঢাকা বা কলকাতা লক্ষ্য ক'রে যেমন ছুঁড়বে নিউইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন লক্ষ্য ক'রে? ইরাকের হুমকিকে অবিশ্বাস্য মনে হয় না, কেননা উন্মত্তত হচ্ছে উন্মত্ততা। যুদ্ধ বাধলে ইরাকের জয়ের কোনোই সম্ভাবনা নেই, তার পক্ষে সম্ভব শুধু সারা পৃথিবীকে বিপন্ন ক'রে তোলা। ইরাক বহু মহাপ্রলয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী; যুদ্ধ বাধলে ইরাক সেগুলোকে গুদামঘরে মজুদ ক'রে রাখবে না; আর সেগুলো নিউইয়র্ক ধ্বংস না ক'রে হয়তো নিশ্চিহ্ন করবে তাদের, যারা যুদ্ধের 'য'-টুকুতেও থাকবে না। পৃথিবীর ধ্বংসের সূচনা হবে হয়তো ওই মধ্যপ্রাচ্যেই, মরুবালুকার উন্মত্ত বিস্ফোরণে। এটা খুব অস্বাভাবিক নয়, উন্মত্ততায় ওই এলাকা এখন অদ্বিতীয়।

নীতিহীন সরকার ও তার অসুস্থ স্বাস্থ্যনীতি

নীতিহীনদের নীতিকথা বলা ও প্রচারের বিশেষ ঝোঁক থাকে, এ-নীতিকথাটি নিয়মিত প্রমাণ ক'রে চলছে বর্তমান সরকার, যার নীতিহীনতা ও দুর্নীতির কোনো পরিসীমা নেই। যে-নীতিতে এটি ক্ষমতায় এসেছিলো,আর আট বছর ধ'রে যে-নীতির বন্যায় স্বাধীনতায় সমস্ত অর্জন ও দেশকে ভাসিয়ে দিচ্ছে, তাতেই দেশবাসীর যথেষ্ট শিক্ষা হচ্ছে, তবু নীতি ছড়ানোয় এর উৎসাহ একটুও কমে নি। এটা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে সরকারের সাড়াজাগানো অসুস্থ স্বাস্থ্যনীতিতে। জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে যে সরকার খুব উদ্বিগ্ন, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই; নিজের নীতিহীনতার এলাকা সম্প্রসারণই সরকারি স্বাস্থ্যনীতির প্রণণা। এ-সরকারের পক্ষে কোনো উপকারই করা সম্ভব নয় জনগণের, তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো একেবারে অসম্ভব। স্বাস্থ্যের মূলকথা ঔষধ ও ডাক্তার নয়, খাদ্য; আর ওই খাদ্যেরই অভাব দেশ জুড়ে। যে-শিশু জন্ম নিচ্ছে অস্পষ্ট শরীরের ভেতরে, জন্মের পর যার কোনো খাদ্য জোটে না, সমস্ত স্বাস্থ্যনীতি, হাসপাতাল ও শতোশতো এফআরসিএস রান্না ক'রে খাওয়ালেও তার স্বাস্থ্যের কোনো উপকার হবে না। এমন কোটিকোটি শিশু বাড়ছে বাঙলাদেশে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য নয়, সবার জন্যে অস্বাস্থ্যই অবধারিত; তখন স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে শুধু সমাজের একটি দেবতাশ্রেণীর। ওই স্বাস্থ্যবান দেবতারা এখন ভোগ ক'রে চলছে জীবনের সমস্ত পুষ্টি, ভবিষ্যতেও ভোগ করবে। জীবন ও স্বাস্থ্য সবই তাদের জন্যে; জনগণের স্বাস্থ্যের কথা বলা প্রতারণা। এখন বছরে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু বরাদ্দ আটাশ পয়সা-এতেই বুঝা যায় জনগণের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে সরকার কতোটা ঘুমহীন রজনী কাটায়। এখন গরিবেরা অন্তত মৃত্যুর আগে হাসপাতালে ঢোকার অধিকার রাখে; এরপর তাও থাকবে না। হাসপাতালে ঢোকতেই টাকা লাগবে, যা নেই দেশের অধিকাংশের। হাসপাতালে ক'মে যাবে বিনাভাড়ার শয্যার সংখ্যা,যাতে এখনো গরিবেরা আশ্রয় নিতে পারে; সেখানে বাড়বে ভাড়াদেয়া শয্যা, আশ্রয় নিবে ধনীরা। এখন হাসপাতালে শল্যচিকিৎসার জন্যে কোনো অর্থ লাগে না; তবে এ- স্বাস্থ্যনীতি কার্যকর হলে লাগবে বারো শো টাকা। কোটিপতি, যদি তিনি দয়া ক'রে নোংরা সরকারি হাসপাতালে আসেন, তাঁরও লাগবে বারো শো টাকা; আর যে কোনোদিন বারো শো টাকা দেখে নি, তারও লাগবে বারো শো টাকা। সহৃদয় সরকার মৃত্যুর আগে তাকে টাকা দেখিয়ে ছাড়াবে। এখন যে- কোনো ডাক্তার দরকারে রোগীদের যে-

www.BDeBooks.Com

কোনো বড়ো হাসপাতালে পাঠাতে পারে; পরে পারবে না। প্রথম সে পাঠাবে উপজেলায়, সেখানে না হ'লে রোগী যাবে জেলায়; সেখানে না হলে যাবে বড়ো হাসপাতালে অর্থাৎ গন্তব্যে। মৃত্যু যেনো সরকারি স্বাস্থ্যনীতি মেনে আসবে; হয়তো সরকারের সাথে মৃত্যুর কোনো চুক্তি হয়েছে; —হওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হয় না, তাদের স্বভাবের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। রোগীর কথা ছেড়ে দিই, তাদের যে দেখার দেখবে, কিন্তু ডাক্তারদের দেখবে কে? দেখবে উপজেলার গণপ্রতিনিধিরা, উপজেলার কীর্তিমান সভাপতিরা? সংসদ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত যারা টাউটারি করছে, তারা কি কেউ গণপ্রতিনিধি? দেশের সমাজবিরোধীরা রয়েছে এসব সংঘে; এবং এদের অধীনে থাকতে হবে ডাক্তারদের। মেধাবী ছেলেটি ডাক্তার হয়েছে, আর মূর্খ সন্তানটি হয়েছে উপজেলা সভাপতি-এতেই নীতির পরাকাষ্ঠা হয়েছে, তাতেও আমরা খুশি নই; এখন আমরা মেধাবী ছেলেটিকে মাস্তানটির অধীনে দিয়ে স্বর্গরাজ্য পাততে চাই। মেধাবী ছেলেটির অপরাধ অনেক-ডাক্তার না হয়ে তার মাস্তান হওয়া উচিত ছিলো, তা হলেই তা সরকারি নীতিসম্মত হতো। ডাক্তার থাকবে উপজেলার সভাপতির অধীনে; সভাপতি মাঝেমাঝে খুনটুন করবে, তার পক্ষে বাধ্য হয়ে সারটিফিকেট দেবে ডাক্তার। তার নৃশংসতা হবে অপ্রতিহত। ডাক্তার সারটিফিকেট না দিলে সভাপতি তাকে পিটোবে, চাকুরি থেকে বরখাস্ত করবে, এমন কি খুন করবে। তিনি বলেছেন, দালানসর্বস্ব চিকিৎসাব্যবস্থা তিনি চান না; প্রশ্ন হচ্ছে দালানগুলো বানালো কে? আপনাআপনি হয়েছে, না ডাক্তাররা বানিয়েছে? এগুলো তো টাকা লুটপাট করার জন্যে বানিয়েছেন তাঁরাই । জানতে হচ্ছে করে স্বাস্থ্যনীতির প্রণেতা কারা? নিশ্চয়ই তাঁরা, যারা কখনো একটি গরিবের চিকিৎসা করে নি, যারা চিকিৎসা করে দেবতাদের, দেশের বাইরে থাকে মাসেমাসে। এ-নীতি বাস্তবায়নের আগে তাদের প্রত্যেককে তিন বছরের জন্যে চিকিৎসক হিশেবে নিয়োগ করা দরকার উপজেলায়, তাদের কাজ করা দরকার উপজেলা সভাপতির অধীনে—তারপরই শুধু তারা বলতে পারে এর বাস্তবায়নের কথা। একটা লোভও দেখানো হয়েছে ডাক্তারদের যে তাদের বেতন বাড়িয়ে দেয়া হবে দেড়শো গুণ। এটা ডাক্তারদের কাছে হাস্যকর—তাদের অনেকে এর বিশগুণ আয় করে; আর অন্যদের কাছে আপত্তিকর—একই যোগ্যতা নিয়ে তারা কেনো কম বেতন পাবে? তারা তো স্বাস্থ্যনীতিপ্রণেতাদের মতো হাত বাড়ালেই টাকা ধরতে পারে না।

স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ডাক্তাররা বিপ্লব বাধিয়ে ফেলেছে। বিপ্লবের রূপ দেখে সুখ পেয়েছি, তবে ভয় পেয়েছি অনেক বেশি—স্বার্থ মানুষকে কতোটা নির্মম করতে পারে, তার উদাহরণ মানবতার নামে শপথকরা চিকিৎসকদের ধর্মঘট। তারা খুবই সুখী মানুষ; পথের মানুষের মতো মিছিল করা অনশন করার কথা তো তাদের নয়। একটি কথা বোঝা গেলো স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সুবিধাবাদিরাও দুর্দান্ত 'বিপ্লবী' হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ সময়ে বেড়ালও মাদার গাছে ওঠে। যে-মন্ত্রী এ-নীতি পেশ করেছে, সে যদি এখন মন্ত্রী না হয়ে ডাক্তারই থাকতো, তাহলে হয়তো তার শ্লোগানে বাতাস কাঁপতো, অনশনের ছবি ছাপা হতো; আর যারা মিছিল করছে, তাদের কেউ যদি হতো মন্ত্রী, তাহলে সে সরকারি নীতি আবৃত্তি করতো পুণ্যশ্লোকের

মতো। তাই এ-বিদ্রোহ দানবের বিরুদ্ধে দেবতাদের সংগ্রাম নয়; এক স্বার্থশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরেক স্বার্থশ্রেণীর লড়াই। আমাদের ডাক্তাররা সুবিধাভোগী শ্রেণী, অনেকাংশেই তারা অমানবিক—বিশেষ ক'রে 'বড়ো ডাক্তার'রা অমানবিকতার প্রতিমূর্তি। তাঁদের অধ্যাপনা পেশার প্রয়োজনে। জ্ঞান দান বা অর্জনের জন্যে তাঁরা অধ্যাপনা করেন না, করেন কেননা তাতে তাঁদের দাম বাড়ে, পেশার সুবিধা হয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলো তাঁদের দাম বাড়ানোর শোকেস। এখানে থাকলে উপাধি জোটে, হাসপাতালটিকে নিজের হাসপাতাল হিশেবে ব্যবহার করা যায়, রোগীরা তাঁর ওপর পোশন করে বেশি আস্থা। এ-পুঁজিটা তিনি ব্যবহার করেন নিজের ক্লিনিকটাকে জমজমাট ক'রে তুলতে। শোনা যায় তাঁরা ক্লাশও নেন না ঠিকমতো, হাসপাতালের রোগীদের ছোঁয়েও দেখেন না মন প'ড়ে থাকে তাঁদের বিকেলের ব্যবসার দিকে; আর বিকেলের ব্যবসায়েও যে মানবিক আচরণ করেন এমন নয়। এক অধ্যাপক, যিনি জাতীয় অধ্যাপক [একটা অদ্ভুত ডারউইনীয় প্রজাতি] হয়েছেন, তিনি আগে হাতে টাকা না পেলে রোগীর দিকে তাকানও না; শোনা যায় বেশি টাকা দিলে তিনি ভাংতিও ফেরত দেন না। তাঁকে বলতে পারি আমাদের বিখ্যাত চিকিৎসকদের বিশুদ্ধ প্রতিনিধি। কশাইবৃত্তিতে তাঁরা যেমন দক্ষ অমানবিকতায়ও তেমনি নিপুণ। এক প্রখর শীতরাতে আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম এক মুমূর্ষু হৃদরোগীকে নিয়ে সোরাওয়ার্দি হাসপাতালে। হৃদরোগীদের চিকিৎসাকক্ষটিতে এতো আঁকাবাঁকা গলি-উপগলি পেরিয়ে—এতো দ্রুত—যেতে হয় যে অধিকাংশ রোগী ওই গলিতেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে; আমার রোগীটিও করেছিলেন। একটি তরুণ ডাক্তার অনেকক্ষণ পরে তাঁকে দেখে মৃত ব'লে ঘোষণা ক'রেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলো; কিন্তু সে কিছুতেই মৃত্যু-সারটিফিকেট দিতে রাজি হয় নি। তাহলে হাসপাতালে মৃত্যুর হার বেড়ে যেতো। সারটিফিকেটের অভাবে সারারাত ওই শীতে ব'সে থাকতে হয়েছিলো হাসপাতালের বারান্দায়, সনদ-না-পাওয়া মৃতদেহ অ্যামবুলেন্স বহন করে না। অতো নিষ্ঠুর তরুণ আমি কখনো দেখি নি। একরাতে একটি খুনিও আমার উপকার করেছিলো, কিন্তু ওই তরুণ ডাক্তারটি করতে রাজি হয় নি। ও-ই আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে নিষ্ঠুর লোক। ওকে আবার যখন দেখা যায় টিভিতে ভালোভালো কথা বলতে, তখন পুরো ডাক্তার জাতিটার প্রতিই বারবার ঘেন্না জন্ম নেয়। তবে সব তরুণ ডাক্তার এমন নিষ্ঠুর নয়, সম্ভবত সব অধ্যাপকও কশাই নয়। তরুণ ডাক্তাররা এখন রয়েছে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে—অধিকাংশই বেকার; আর যারা চাকুরি পেয়েছে উপজেলায়, তাদের জীবন অনেকটা বিপন্ন। স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়িত হ'লে তাদের জীবন হবে শোচনীয়। এ-পর্যায়ে শুধু অধ্যাপকদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করা যায়। জনগণের কোনো মঙ্গল করতে পারে শুধু একভাবে—বিদায় নিয়ে।

www.BDeBooks.Com

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : এক গুলাগ দ্বীপ?

অসাধারণ এটি; —এখানে প্রতিযোগিতা ক'রে অসাধারণ ছাত্ররা ভর্তি হয়, অনেকটা পাগল থাকে তারা এখানে ভর্তি হওয়ার জন্যে, আর তাদের পিতামাতারাও শান্তি পায় একথা ভেবে যে তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সোনায় বাঁধানো হয়ে গেলো। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে জ্ঞানলাভের বাসনা যতোটা থাকে, তার থেকে বেশি থাকে ধনলাভের স্বপ্ন। তবে এর অবস্থান, এর শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি এটিকে অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত না ক'রে একে পরিণত করেছে এক উপবিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে বা যে-কোনো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুতে রয়েছে যে-স্বাধীনতার বিস্তার, তা নেই এখানে। এর জলবায়ু শ্বাস রোধ করে, প্রান্তরের মুক্ত বাতাস এখানে এসে আটকে যায়। এর জলবায়ু বন্দী; জীবনও তাই বন্দী এখানে। এর অধ্যাপকেরা নিশ্চয়ই জ্ঞানী নিজেদের বিদ্যায়, কিন্তু তাঁরাও বন্দী জলবায়ুর শিকার। বিজ্ঞানী ঔপন্যাসিক সি পি স্নো কয়েক দশক আগে 'দুই সংস্কৃতি' নামে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে দেখাতে চেয়েছিলেন যে মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের জগতের মানুষেরা ভাগ হয়ে গেছেন 'দুই সংস্কৃতি'তে; —তাঁদের এক গোত্র সাহিত্য-শিল্পকলা বোঝেন, বিজ্ঞান বোঝেন না; আরেক গোত্র বোঝেন বিজ্ঞান, কিন্তু তাঁরা শিল্পসাহিত্যের ডাকে সাড়া দেন না। অর্থাৎ তাঁরা হয়ে উঠেছেন একে অন্যের কাছে অবোধ্য ও দুর্বোধ্য দু-বিশ্বের অধিবাসী, যাঁরা বান্ধব হবেন না, হবেন শত্রু। স্নো অবশ্য পক্ষ নিয়েছেন বিজ্ঞানের লোকদের, তিনি নিজে মূলত বিজ্ঞানের মানুষ ব'লেই। তিনি দাবি করেছিলেন যে শিল্পসাহিত্যের লোকেরা বিজ্ঞান বোঝেন না ব'লেই পৃথিবী সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছে; তবে তাঁর কথা সত্য হয়ে উঠছে উল্টোভাবে। দেখা গেছে বিজ্ঞানের লোকেরাই বিজ্ঞান ছাড়া আর সব কিছুতে উৎসাহহীন; তাঁরা ধার ধারেন না শিল্পসাহিত্যের, মানবিকতার। তাঁরা বন্দী হয়ে পড়েছেন এক সংকীর্ণ জগতে; এবং তাঁরাই সমস্যা হয়ে পড়েছেন মানবজাতির জন্যে; হয়ে পড়েছেন অমানবিক। অনেক আগেই হাক্সলি বিজ্ঞানীদের অমানবিকতা ভয়ংকরভাবে দেখিয়েছিলেন। আমাদের দেশে সৃষ্টিশীল বিজ্ঞান নেই, রয়েছে অনুকরণাত্মক বিজ্ঞান; আর এর চর্চাকারীরা অত্যন্ত সংকীর্ণ; অনেকে আবার বিজ্ঞানের মূলবাণীতেও বিশ্বাস করেন না। প্রকৌশলীরা শিল্পকলা ও মানবিকতা থেকে অনেক দূরে থাকনে; আর আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টিও মানবিকতা থেকে স'রে গেছে অনেক দূরে। শোনা যায় সেখানে শাস্তিই জীবনপদ্ধতি। ছাত্ররা সেখানে সব সময় ভয়ে থাকে শিক্ষকদের, কেননা তাঁরা যখন তখন যে-কোনো শাস্তি দিতে পারেন ছাত্রদের; এবং মাঝেমাঝে বজ্রপাতের মতো তাঁরা নেমে আসেন ছাত্রদের মাথার ওপর।

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অধ্যাদেশসম্মতভাবে এতো রকমের শাস্তি দিতে পারেন ছাত্রদের যে তাঁদের একেকজনকে শাস্তির দেবতা, ছোটো ছোটো জিহোভা বলেই মনে হয়। পড়াশুনো অবহেলা করলে শিক্ষক ছাত্রকে পাঁচ টাকা জরিমানা করতে পারেন, বিভাগীয় প্রধান তাকে বিশ টাকা জরিমানা করতে পারেন, প্রাধ্যক্ষ তাকে ছাত্রবাস থেকে বের ক'রে দিতে পারেন, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক তাকে বহিষ্কার করতে পারেন, আবাস ও শৃঙ্খলা পরিষদ তার সম্পূর্ণ জীবন নষ্ট করে দিতে পারে; এবং আরো কতো কী যে পারে তার কোনো শেষ নেই। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশটি বিশ্রী কালো রঙের; আর এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ: বইটি একরাশ কালাকানুনের সমষ্টি। শাস্তির এতো চমকপ্রদ ধারা এতে বাজে ইংরেজিতে ছাপা হয়ে আছে যে একে সুকুমার রায়ের এক আদর্শ 'শিবঠাকুরের আপন দেশ' মনে হয়, যার নিয়মকানুন খুবই সব্বনেশে। একে বন্দীশিবিরের নৃশংস হাস্যকর বিধিমালা ব'লেও মনে হয়। সম্ভাব্য শাস্তির এতো বিবরণ আছে কালো বইটিতে যে একে হিংস্র জিহোভার নিজের হাতে লেখা একটা নতুন বই মনে হয়। আমার মনে পড়ছে সোলঝিনিৎসিনের গুলাগ দ্বীপপুঞ্জের কথা। স্তালিনের কালে রুশদেশ জুড়ে যে-মর্মান্তিক পীড়ন চলেছিলো শ্রমশিবিরগুলোতে, তাই যেনো চলছে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে; এবং এটি হয়ে উঠেছে একটি ভীতিকর গুলাগ দ্বীপ। পীড়নই যেনো ওখানকার শিক্ষদানের দর্শন। স্বৈরাচারমূলক রাষ্ট্রে যেমন সকলকে বিভ্রান্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয় 'ডবলস্পিক'-যুদ্ধকে বলা হয় 'শান্তি', হত্যাকে 'সমাধান', ঠিক তেমনি এ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রপীড়নকে বলা হয় 'ছাত্রকল্যাণ'। এর ছাত্রকল্যাণ সংস্থাটির কাজ, ছাত্রদের মতে, ছাত্রপীড়ন। যে-বিধিবলে ওখানে পীড়ন চলে, তার নাম 'আবাস ও শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ'-গৃহীত হয়েছিলো ৬৭তে। কালো বইটিতে ছাত্রকল্যাণসংস্থা ছাত্রদের কী কী শাস্তি দিতে পারে, তার বিবরণ আছে, কিন্তু কী কী কল্যাণ করতে পারে তার কোনো উল্লেখ নেই। এ-সংস্থাটি বিশ্বাস করে বহিষ্কারবাদে। এ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাস করে বহিষ্কার আতংকের মধ্যে; যে-কোনো সময় ওই বজ্র নেমে আসতে পারে নীলাকাশ থেকে, এবং দগ্ধ হয়ে যেতে পারে সমগ্র জীবন।

কিছু দিন আগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় চারজন ছাত্রকে। তারা সবাই একই ছাত্রাবাসের, জাতীয় ধর্মের দেশে এটা উল্লেখযোগ্য যে তারা চারজনই হিন্দু। এ-বহিষ্কারের পেছনে সাম্প্রদায়িকতা কাজ করতে পারে, ওখানকার অনেকেই বিজ্ঞানের থেকে তবলিগে বেশি বিশ্বাস করেন। ওই ছাত্রদের কোনোই অপরাধ ছিলো না, যদি না ভালো কাজ করাকেও আমরা অপরাধ গণ্য করি। যে-ঘটনা এ-বিরাট ঘটনার পেছনে, তা এতো সামান্য যে তার একটা ধমক দেয়াও হাস্যকর; বরং পুরস্কারই প্রাপ্য ছিলো তাদের; কিন্তু বিচারকদের অব্যবস্থিতার জন্যে তারা চরমভাবে দণ্ডিত হয়েছে। ছাত্রাবাসের পাশের একটি দোকান থেকে তারা কয়েকটি নকল স্যাভলনের বোতল উদ্ধার করে, কিন্তু প্রাধ্যক্ষের কাছে একে মনে হয় ছাত্রদের অমার্জনীয় অপরাধ। শুরু হয় বহিষ্কার, তদন্ত, বহিষ্কার; আর প্রকৌশলী অধ্যাপকের বিচারক হিশেবে পরিচয় দেন ব্যর্থতার, কিন্তু দণ্ডদাতা হিশেবে হয়ে উঠেন নির্মম। সারা

www.BDeBooks.Com

দেশ জুড়ে যে-নৃশংসতা চলছে—চলছে ধর্ষণ, পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি—তাতে যোগ দেন প্রকৌশলী বিচারকেরা। দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতার কাঁদার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তবে এ-দণ্ডদাতারা ওই বাণীতে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা বিশ্বাস করেন দণ্ডিতকে চিরকালের জন্য কাঁদানোয়। একজন ছাত্রকে শাস্তি দেয়া ও একটি দস্যুকে শাস্তি দেয়া যে এক কথা নয়, তাঁরা তা বোঝেন না। আমাদের অপরাধ জগতে, যেখানে আমরা সবাই কমবেশি অপরাধী আর শক্তিমান মাত্রই চূড়ান্ত অপরাধী, সেখানে বিচারও নানা অপরাধে অপরাধী। গুরুপাপীরা এখানে সম্মানিত, লঘু অপরাধীরা গুরুদণ্ডে দণ্ডিত। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের কথা মনে পড়ছে;—সে গ্রন্থাগার থেকে একটি বই চুরির অপরাধে কয়েক বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়। পরে সে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পায়; বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকের চাকুরিও পায়। তার নিয়োগ নিয়ে ভণ্ড নীতিবাদীদের মধ্যে কোলাহল প'ড়ে যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত ছাত্রটিকে চাকুরি দিলে যেনো বেহেস্ত চৌচির হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে বেশি অপরাধী? যে-ছাত্র একটি বই চুরি করেছে, সে; নাকি তার বিচারকেরা, যাঁরা একটি বই চুরির জন্য কয়েক বছরের জন্য বহিষ্কার করেন একটি ছাত্রকে? আমি ওই বিচারকদের মনে করি অপরাধী। ওই তরুণের কয়েকটি সুন্দর বছর নষ্ট করার পাপ তাঁরা কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। ওই তরুণটি ছিলো দুর্বল, তাই তাকে দণ্ডিত করা হয়েছিলো সামান্য অপরাধে। আমি এক শক্তিমানকে জানি যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি একাডেমি ও একটি কমিশনের কয়েক হাজার বই চুরি করেছে, কোনো শাস্তি পায় নি; বরং পুরস্কারে ও সম্মানে তাঁর ইহকাল স্ফীত হয়ে উঠেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকদের ছাত্ররা 'হিটলারের প্রেতাত্মা' বলে চিহ্নিত করেছে। তাঁরা যেভাবে স্বীকারোক্তি বের করার চেষ্টা করেছেন ছাত্রদের মুখ থেকে, তাতে হিটলারের বন্দীশিবির ও রাশিয়ার গুলাগের তদন্তকারীদের মুখ মনে পড়ে। অশীল ভাষা, মনস্তাত্ত্বিক পীড়ন, অপমান, শারীরিক পীড়ন প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছে তাঁরা; এবং স্বেচ্ছাচারী শাস্তিবিধান করেছেন। এ-চারজনের বহিষ্কার হচ্ছে কালাকানুনের স্বেচ্ছাচার, অত্যন্ত কলংকজনক ঘটনা। এর ফলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষাকার্যক্রমেও। বাঙলাদেশের অধিকাংশ এলাকা থেকেই বিবেক উঠে গেছে; শিক্ষাজগত থেকেও যদি উঠে যায় ওই সম্পদটি, তাহলে শিক্ষারও কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আশা করছি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় তার হারানো বিবেক ফিরে পারে, প্রত্যাহার করে নেবে বহিষ্কারের কালো আদেশ। এর সাথে ওই কালো বই থেকে বর্জন করা দরকার 'আবাস ও শৃঙ্খলা' অংশটি। বইটির মলাটের রঙও বদলানো দরকার। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথার ওপর একটা কালো বই চেপে থাকার দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

চর্মরোগগ্রস্ত মন্ত্রীসভা ও আধ্যাত্মিক পাউডার

অনৈতিক সমস্ত রোগেই তারা আক্রান্ত, এটা ভালো ক'রেই জানে দেশবাসী; শুধু জানা ছিলো না যে দেশের মাননীয় মন্ত্রীসভাটি আক্রান্ত চর্মরোগেও। চর্মরোগ খুবই অশ্লীল; তা হৃদরোগের মতো সম্ভ্রান্ত নয় রক্তচাপের মতো বুর্জোয়া নয়; খুব ঘিনঘিনে এ-রোগটি—রোগীকে শান্ত থাকতে দেয় না, সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত ক'রে রাখে। মন্ত্রীরা অসাধারণ, সাধারণ মানুষ এ অসাধারণদের কাছাকাছি আসতে পারে না; তাই অনেক অন্তরঙ্গ সংবাদই তাদের থাকে অজানা। কাছাকাছি থাকে যারা অন্তরঙ্গভাবে তারা জানে কোন অসাধারণের কোন অঞ্চলে অসাধারণ জ্বালা; চাকর জানে প্রভুর চর্মবিদায়ী দাদের খবর, নাপিত জানে মহানায়কের কোন কানটি ছিন্ন। ভৃত্য ও স্ত্রীর কাছে কেউই মহাপুরুষ নয়। তবে ওই সব অন্তরঙ্গ তথ্য থাকে অন্তরঙ্গেই; কেউ ফাঁস করে না। বঙ্গভবনের মন্ত্রীসভাটি যে চর্মরোগজর্জরিত, এটা জানতো ভেতরের অনেকেই। তারা এতোদিন চেপেছিলো এ-সংবাদটি; কিছুদিন আগে এটা ফাঁস ক'রে দিয়েছেন এক 'আধ্যাত্মিক' আবিষ্কারক। আধ্যাত্মিকতাই এখন আমাদের বিজ্ঞান; পীরবাদই আমাদের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র। আধ্যাত্মিকেরাই এখন আমাদের নিউটন, আইনস্টাইন। এ-আধ্যাত্মিক আইনস্টাইন খুব উপকার করেছেন আমাদের : তিনি আমাদের বৈজ্ঞানিকের অভাব মিটিয়েছেন; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বোস প্রফেসর পদের জন্যে আমন্ত্রণ জানাবে কিনা ভেবে দেখতে পারে। তিনি একটি অভাবিত আবিষ্কার সম্পন্ন করেছেন, সম্ভবত এটা বছরের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার; এবং তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে বঙ্গভবনের নাদুশনুদুশেরা আসলে চর্মরোগস্ত। জনগণ কি সাধে দূরে থাকে তাদের থেকে? জনগণের রয়েছে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, তাই তারা দূরে থাকে মন্ত্রীদের থেকে যাতে তারা সংক্রমিত না হয় ওই অশ্লীল রোগটি দিয়ে।

আবিষ্কারক দৈনিক কাগজে দু-পাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রীদের রোগের কথা। ওই বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি মন্ত্রীসভায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে রোগটি। প্রভু যে মাঝেমাঝেই মন্ত্রী বাদ দেন, তা কি চর্মরোগের জন্যেই? তিনি সব জানেন, তার তো কিছু অজানা থাকার কথা নয়! জাতি দারুণ কৃতজ্ঞ আধ্যাত্মিক আইনস্টাইনের কাছে, তাঁর আধ্যাত্মিক হিমেল পাউডারের কাছে। মন্ত্রীরা ওই বিজ্ঞাপনে অকপটে স্বীকার করেছে তাদের রোগের কথা, আধ্যাত্মিক পাউডারের ঐশী উপকারিতার কথা। সুন্দর সুন্দর ছবিও ছাপা হয়েছে তাদের; বিদেশে তৈরি দামি

www.BDeBooks.Com

দামি স্যুটকোট পরা তারা; কিন্তু ওই বিদেশী স্যুটও একটি সত্য ঢেকে রাখতে পারেনি যে তাদের শরীর ছেয়ে গেছে চর্মরোগে, আত্মাগুলো তো অনেক আগেই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক আবিষ্কারকের হিমেল পাউডারের গুণগানে তারা মুখর, যদিও ভাষা ভুল পংক্তিতে পংক্তিতে। চর্মরোগীর কাছে কে আর আশা করে শুদ্ধ বাঙলা ভাষা? উপরাষ্ট্রপতি বলেছে, এর সব কটি গুণাগুণ আমাকে মোহিত করেছে।' বলে কি উপরাষ্ট্রপতি—আধ্যাত্মিক পাউডারেরও রয়েছে 'গুণাগুণ' অর্থাৎ 'দোষগুণ'? এর তো শুধু গুণ থাকার কথা, 'অগুণ' থাকার কথাতো নয়। বিজ্ঞাপনে বলাই হয়েছে এ-পাউডার মহৌষধ। তাহলে কি ভাষা ভুল করেছে উপরাষ্ট্রপতি, কণ্ডুয়নের আধিক্যে কি ঘটেছে এমন অনাধ্যাত্মিক স্খলন? মন্ত্রীসভার গোয়েবলস ঝেড়েছে তার স্বভাবসুলভ অতিশয়োক্তি; বলেছে, এ-পাউডার, 'রোগ-প্রতিরোধে অদ্বিতীয়।' এটা হয়তো বাড়াবাড়ি নয়, তার ঘা যাতে সারে তার তুলনা হয় না। এক বালক বলেছে, 'আমি এই পাউডার ব্যবহার করে মুগ্ধ হয়েছি।' পাউডার ব্যবহার ক'রে কেউ মুগ্ধ হয়? আমরা তো জানি পাউডার ব্যবহার ক'রে পাড়ার উত্তমেরা মুগ্ধ করে পাড়ার সুচিত্রাদের। এ-বালক নিজেই মুগ্ধ হয়ে বসলো, অন্য কাউকে মুগ্ধ করতে পারলো না এর জ্যোতিতে? তাহলে কি আধ্যাত্মিকতা ঠিকমতো কাজ করে নি এর বেলা? সরকারের এখন খুব আর্থিক দুর্দিন চলছে–লুটপাটে বাঙলাদেশ ব্যাংক শূন্য হয়ে গেছে; তাই সরকার একটি চমৎকার কাজ করেছে রুগ্ন মন্ত্রীসভাটিকে মডেল-সভা হিসেবে ব্যবহার করে। যেভাবে দুটো পয়সা আসে, তাই ভাবা দরকার সরকারের। জ্যোতি হিমেল পাউডারের মডেল হয়ে চর্মরোগীরা যে দুটো পয়সা করেছে অর্থকোষের জন্যে, এটা সুখের কথা। সরকার এদের কোনোদিনই মন্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি, দিয়েছে মডেলের মর্যাদা। আশা করবো সরকার এদের প্রতিদিন মডেলরূপে ব্যবহার ক'রে কিছু আয় করবে; যা তারা লুটপাট করে শেষ করেছে, তার এককণাও যদি তারা আয় করে, তাতে সবারই মঙ্গল।
আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিকে এখন দেশ ছেয়ে গেছে; পাড়ায় পাড়ায় এখন গবেষণাগার খুলে বসেছেন আধ্যাত্মিক আবিষ্কারকেরা। এ-আবিষ্কারক দাবি করেছেন, 'আমি একজন আধ্যাত্মিক সাধক।' আধ্যাত্মিক সাধকেরা কখনো এমন দাবি করেন না, করে ভণ্ডরা। খুবই মহান তিনি—দাবি করেছেন, 'দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তা দিয়ে আমি মানুষের সেবা করতে চাই।' দাবিটা কি ইসলামসম্মত হলো? 'আল্লাহ্ পাক' কি কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন সাধনার জন্যে? এটা পুরোপুরি ইসলাম বিরোধী কথা; কিন্তু তা বলে ফেলেছেন এ—আধ্যাত্মিক আবিষ্কারক। তিনি বলেছেন, 'আমি সবাইকে বলি– আমিও একজন সাধারণ মানুষ।' এটাও প্রচণ্ডভাবে ধর্মবিরোধী, কেননা এখন 'অসাধারণ' কোনো মানুষ নেই। তিনি যে নিজেকে 'সাধারণ মানুষ' বলেছেন এটা বিনয় নয়, অহমিকা; তিনি বোঝাতে চান তিনি অসাধারণ। আধ্যাত্মিক মানুষেরা কখনো কিছু 'আবিষ্কার' করেন না, বাজারে ছাড়েন না, পুঁজি গড়েন না। এখনকার আধ্যাত্মিকতার মূলকথা হচ্ছে পুঁজি : তারা পুঁজিকে আধ্যাত্মিকতায় আর আধ্যাত্মিকতাকে পুঁজিতে পরিণত করে। তিনি যদি আধ্যাত্মিক হন, আর 'আল্লাহ্ পাক' যদি তাকে ক্ষমতা প্রদান করে থাকে, তাহলেও বুঝতে হবে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি বেশি এগোন নি;– তাঁকে আল্লাহ্ দিয়েছে পাউডারের মতো

একটা তুচ্ছ বহুপ্রচলিত প্রসাধন সামগ্রী পুনরাবিষ্কারে ক্ষমতা। পাউডার বহু আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেক ফুলবাবু তা ঘাড়ে মেখেছে, তা পুনরাবিষ্কারের কোনো দরকার ছিলো না। আধ্যাত্মিক সাধনায় আরো বড়ো কিছু আবিষ্কার করা যেতো না?—অভিনব কোনো যানবাহন, মহাজাগতিক খেয়াতরী, যন্ত্রপাতিহীন টেলিভিশন, বা অবৈদ্যুতিক বাত? এ আবিষ্কারক যা করেছেন, তা হচ্ছে একরাশ রুগ্ন মন্ত্রী ব্যবহার ক'রে দ্রুত পুঁজি অর্জনের চেষ্টা। আধ্যাত্মিকতা এখন 'আবিষ্কারক'দের হাতে পড়ে হয়েছে এতোই শোচনীয়।

আধ্যাত্মিক হিমেল পাউডার কোনো নিরাময় নয়, এটা এ-সময়ের এক বড়োরোগ, যেমন কর্কটরোগের মতো ভয়াবহ বঙ্গভবনের চর্মরোগীরা। বঙ্গভবনের রোগীরা কেউ বিলেতে পড়েছে, সবাই স্যুটকোটসজ্জিত; সবাই পশ্চিমি সভ্যতার সমস্ত উপকরণে লালিত, কিন্তু পশ্চিমের বুর্জোয়া মনটি তারা আয়ত্ত করতে পারে নি। তারা সবাই পরগাছার মতো। আধ্যাত্মিক আবিস্কারকেরা ধ'রে আছেন মধ্যযুগকে, তাঁরা নিরক্ষর মানুষের ধর্মবোধ পুঁজি ক'রে এতো দিন চালিয়ে এসেছেন, এখন পদানত ক'রে ফেলেছেন অক্ষরসম্পন্নদেরও। আমাদের সমাজ চলছে গভীর মধ্যযুগ ও লুম্পেনদের পারস্পরিক সহযোগিতায়; এরা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। জোব্বা পৃষ্ঠপোষকতা করে স্যুট ও উর্দির; আর স্যুট ও উর্দি পৃষ্ঠপোষকতা করে জোব্বার। পীরবাদ ইসলাম বিরোধী, ইসলাম কোনো আধ্যাত্মিক-মাধ্যম স্বীকার করে না; কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মের নামে চলছে প্রগতিবিরোধী সবকিছু। হিমেল পাউডার কোনো রোগ সারাবে না, এর গুণ হিসেবে যা কিছু দাবি করা হয়েছে, তার কোনোটিই হয়তো সত্য নয়– এটি নিরাময় নয়, এটি রোগ। পাউডার হচ্ছে পাউডার; এতে কোনো আধ্যাত্মিক উপাদান থাকতে পারে না। এ-পাউডার বঙ্গভবনের চর্মরোগীদের রোগ সারিয়েছে কিনা জানি না, তবে ওই রোগ যাতে সমাজে সংক্রামিত হ'তে না পারে, সেটা দেখা দরকার। কিছুতেই ভুললে চলবে না যে ওই পাউডার রোগ, আর ওই মডেল রোগীরা হচ্ছে সমাজে রোগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম।

www.BDeBooks.Com

নারীরাই কি স্বৈরাচারের শেষ প্রধান প্রতিপক্ষ?

পৃথিবী, 'সভ্যতা'র শুরু থেকেই, স্বৈরাচারপীড়িত; আর পৃথিবী জুড়ে চলছে স্বৈরাচার। মাত্র কয়েকটি দেশের শাসকেরা জনগণের সম্মতি পেয়ে শাসন করছে দেশ; তবে অধিকাংশ দেশেই দেখা যায় একটি ব্যক্তি ও তার গোত্র অস্ত্রের জোরে দেশ দখল করেছে, ও শাসন করছে। জনগণ তাদের অস্ত্র কিনে দিয়েছিলো, তাদের দায়িত্ব দিয়েছিলো অস্ত্রের; তারা ওই অস্ত্রের বিধিসম্মত ব্যবহারের শপথ করেছিলো, কিন্তু শপথ রক্ষা করে নি। তাদের নিয়োগ করা হয়েছিলো প্রহরীরূপে; তারা রাতের অন্ধকারে দখল করেছে গৃহ। তারা অনেকে অস্ত্র কোমরে নিয়েই শাসন করে দেশ, লুটপাট করে সংঘবদ্ধভাবে, পীড়ন করে; আবার অনেকে পোশাক পাল্টে, গোঁফ কামিয়ে ভদ্র হয়, স্মিত হাসে, জনগণের সাথে হাত মেলায়; এমনকি কবিতা লেখে। তাদের স্মিত হাসির পেছনেও বন্দুক থাকে; ওই বন্দুকই তাদের স্মিত হাসির নিরাপত্তা বিধান করে। পীড়নের উত্তর হচ্ছে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। পুরুষেরাই ঐতিহাসিকভাবে দেখা দিয়েছে প্রতিবাদীরূপে, বিদ্রোহ করেছে তারাই। পুরুষ স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে পুরুষ দ্রোহীরা, পতন ঘটিয়েছে এক নায়কগোত্রের। প্রতিবাদী, বিদ্রোহী হিসেবে পুরুষেরা যে এখন বাতিল হয়ে গেছে, পরিণত হয়েছে জীবাশ্মে, বা পৃথিবীর সব পুরুষ পরিণত হয়েছে নপুংসক বৃষে, তা নয়; তারা দেশে দেশে চমৎকারভাবে পালন করছে ওই দায়িত্ব; তব নারীরাও সম্প্রতি দেখা দিয়েছে প্রবল প্রতিবাদী বিদ্রোহীরূপে। অনেক দেশে তারা হয়ে উঠেছে বিকল্পহীন। ওই সব দেশে নপুংসক বৃষের সংখ্যা খুব বেশি; আর যারা ছিলো বিদ্রোহী পুরুষ, তাদের অধিকাংশকেই নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে স্বৈরাচারীরা। তাই নারীরাই বিকল্পহীনভাবে হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী নেত্রী। পাকিস্তানের দিকে তাকালে চোখে পড়ে বৃষবাহিনী, যারা দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছে একনায়কের পায়ে; বাঙলাদেশে চোখে পড়ে একই দৃশ্য। পাকিস্তানে বিদ্রোহীরূপে দেখা দিয়েছিলো একটি তরুণী; সে-ই হয়ে উঠেছিলো স্বৈরাচার ও সেনাবাহিনীর প্রধান প্রতিপক্ষ। জনগণ ছিলো তার সাথে; জনগণ ছাড়া সে খড়কুটোর মতো ভেসে যেতো; আবার ওই তরুণীকে ছাড়া জনগণ হতো এক নিষ্ক্রিয় শক্তি। জনগণ অনেকটা বস্তুর মতো; তার ভেতর যে-আণবিক শক্তি রয়েছে, তাকে বিস্ফোরিত করার শক্তি তার নেই; নেতানেত্রী কাজ করে অনুঘটকরূপে। পাকিস্তানে ওই রূপসী তরুণীটি দেখা দিয়েছিলো বিস্ফোরক অনুঘটকরূপে। তার কোনো বিকল্প ছিলো

না। পাকিস্তানে অনেক বিশাল দেহের পুরুষ ছিলো, বুদ্ধিমান ছিলো অনেক, সাহসীও ছিলো; কিন্তু কেউ স্বৈরাচারের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তানি স্বৈরাচার ছিলো নৃশংস; কোনো পুরুষের পক্ষে সেখানে মাথা তোলা ছিলো অসম্ভব। মাথা তোলার অর্থ ছিলো মাথা হারানো। ফিলিপিনসেও ঘটে একই ঘটনা, ঘটে অত্যন্ত দ্রুত। সেখানকার জনগণ তৈরি হয়েই ছিলো বিস্ফোরিত হওয়ার জন্যে, শুধু তাদের দরকার ছিলো এমন একজনকে যে এসে ঘটাবে বিস্ফোরণ। কোনো পুরুষ ঘটায়নি ওই অসামান্য ঘটনা, ঘটিয়েছে এক নারী। অবশ্য এ -দুজনের পেছনেই উপস্থিত রয়েছে দুজন অনুপস্থিত প্রচণ্ড পুরুষ;—একজনের পেছনে পিতা আরেকজনের পেছনে স্বামী। স্বৈরাচার পুরুষ বিদ্রোহীদের সহ্য করে না, তাদের নৃশংসভাবে নিহত করে। পাকিস্তানে তারা তাদের প্রতিপক্ষ পুরুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, ফিলিপিনসে প্রকাশ্যে খুন করেছে। তাই অন্য কোনো পুরুষের পক্ষে বিদ্রোহীরূপে এগিয়ে আসার অর্থ অপমৃত্যু। এ-জন্যে নারীরাই এখন স্বৈরাচারের প্রধান প্রতিপক্ষ, শেষ প্রতিপক্ষ। কিছুদিন আগে ব্রহ্মদেশেও ঘটেছে একই ঘটনা। তার পিতা নিহত হয়েছিলো চার দশক আগে; আর ব্রহ্মদেশ চার দশক ধ'রে পড়ে আছে স্বৈরাচারী সেনানায়কদের ভারী বুটের নিচে। তাদের কোনো প্রতিপক্ষ দেখা যায় নি। যায় নি বলা ঠিক হবে না, যারা দেখা দিয়েছিলো, তারা নিহত হয়েছে; জনগণ বুটের নিচে প'ড়ে থেকেছে নিস্প্রাণ বস্তুর মতো। ওই নিস্প্রাণ বস্তু বিস্ফোরিত হয় যখন প্রবাস থেকে ফিরে আসে এক রূপসী নারী, যে বন্দুকের সম্পূর্ণ বিপরীত; যে গোলাপ পাপড়ির মতো। সে-ই বিস্ফোরিত করে ব্রহ্মীদের, সেনানায়কেরা হঠাৎ এক রূপসীকে নিজেদের প্রতিপক্ষরূপে পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়। তাকে তারা গৃহে বন্দী ক'রে রাখে, তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে; এমন কি তার গৃহের প্রহরীদের প্রতিদিন বদলি করা হয় এ—ভয়ে যে ওই রূপসীর সম্মোহনে প'ড়ে যেতে পারে সশস্ত্র প্রহরীরাও। সেনানায়কেরা নির্বাচনের আশ্বাস দেয়; সম্প্রতি ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রহ্মদেশে। তারা ওই রূপসী বিদ্রোহীকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেয় নি, ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি, তার দলের প্রার্থীদের প্রচারসভা করতে দেয় নি, প্রকাশ্যে জনগণকে তার নাম উচ্চারণ করতে দেয়নি; কিন্তু নির্বাচনে তার দল লাভ করে প্রায় সমস্ত আসন। জনগণ ওই নারীর নামে 'মাথলা'য় ভোট দিয়েছে দলেদলে, ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে ভোট দিতে গেছে, সেনানায়কদের জানিয়ে দিয়েছে তারা তাদের চায় না। ব্রহ্মদেশে অনেক পুরুষ নপুংসক বৃষের ভূমিকা পালন করেছে, অনেক বিদ্রোহী পুরুষ নিহত হয়েছে; শেষে স্বৈরাচারের সফল প্রতিপক্ষরূপে দেখা দিয়েছে এক রূপসী। তার পেছনেও আছে পিতা। তার পিতা অনেক আগে নিহত হয়েছিলো; তবে শারীরিকভাবে হত্যা ক'রেও সেনানায়কেরা তার পিতার শক্তিকে হত্যা করতে পারে নি। ওই শক্তিই কন্যাকে করে তুলেছে স্বৈরাচারের শেষ, সফল, প্রধান প্রতিপক্ষ।

নারী বিদ্রোহীদের মানচিত্রে বাঙলাদেশের অবস্থাও স্পষ্ট। বাঙলাদেশি স্বৈরাচার অধিকাংশ পুরুষকে নপুংসক বৃষে পরিণত করেছে, দুশ্চরিত্র ক'রে তুলেছে অধিকাংশকে। তারা আর স্বৈরাচারের প্রতিপক্ষ হওয়ার যোগ্য নয়। সমস্ত যোগ্যতা তারা হারিয়েছে বিদ্রোহী হওয়ার। বাঙলাদেশি স্বৈরাচার পাকিস্তানি, ফিলিপাইনি, ব্রহ্মী স্বৈরাচারের মতো হিংস্র নয়; তবে তা আরো বেশি ক্ষতিকর। পীড়ন মানুষকে বিদ্রোহী

www.BDeBooks.Com

করে; কিন্তু তাকে পীড়ন না ক'রে যদি তার দিকে মাঝেমাঝে ছুঁড়ে দেয়া হয় মাংস, তাহলে মানুষ কুকুরে পরিণত হয়। বাঙলাদেশি স্বৈরাচার পীড়নের বদলে বাসি মাংস ছোঁড়ার কৌশল নিয়েছে; তা পুরুষদের প্রতিবাদী না ক'রে কুকুরে পরিণত করছে। প্রতিটি পুরুষ রাজনীতিকের জিভ এখানে লকলক করে, ভালোভাবে তাকালে তাদের জিভে পাভলভি কুকুরের লালা দেখা যায়। লালা চেটে কিছুদিন কাটে তাদের, সুযোগ বুঝে তারা ছুঁড়ে দেয়া বাসি মাংসে কামর দেয়, লেজ গুটিয়ে পায়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, কুকুর হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশের চারদিকে মাংসলোভীদের কামড়াকামড়ির শব্দ শোনা যায়; তাদের দু-পায়ের নিচে ঢুকে যাওয়া লেজ দেখা যায়। বাঙলাদেশে পুরুষেরা বাতিল হয়ে গেছে। এখানেও স্বৈরাচারের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে দুই নারী;– তাদের পেছনেও রয়েছে দুই নিহত পুরুষ। একজনের পেছনে নিহত পিতা, আরেকজনের পেছনে নিহত স্বামী। বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ এ-দুই নারীই, কেনো পারছে না জনগণকে বিস্ফোরিত করতে? এর কারণ কি এই যে তারা স্বৈরাচারের যতোটা প্রতিপক্ষ, তার চেয়েও বেশি প্রতিপক্ষ পরস্পরের? তারা কি নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছে নিজেদেরই বিরুদ্ধে, যদিও তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার কথা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে? নাকি তারা বাঙালির আবেগকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিয়েছে? এক নারী যদি প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দিতো, তাহলে কি বিস্ফোরণ ঘটে যেতো এতোদিনে? নাকি তারা নিয়ন্ত্রিত? এসব প্রশ্নের উত্তরে যাচ্ছি না; তবে তারা জাতির আবেগকে আলোড়িত করতে পারছেন না, যদিও জাতি তাদেরই গণ্য করে স্বৈরাচারের শেষ ও প্রধান প্রতিপক্ষরূপে।

নেকড়েদের বিদায় : গণঅভ্যুত্থানেই মুক্তি

কোনো জাতি যখন মেষের পাল হয়ে ওঠে, তখন ওই জনপদে নেকড়েরাই প্রভু হয়ে দেখা দেয়। বাঙালির চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ-জাতি কোনো দশকের শুরুতে বা শেষপ্রান্তে বিকশিত হয় বিদ্রোহীরূপে; আবার অনেক দিনের জন্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় একপাল নিরীহ মেষে। বায়ান্নো, উনসত্তর, একাত্তর, সাতাশিতে বিকাশ ঘটে তার বিদ্রোহী সত্তার; আর আটান্নো, পঁচাত্তর, বিরাশিতে বাঙালি আপাদমস্তক মেষে পরিণত হয়। নেকড়েই চিরকাল মেষের প্রভু। বিরাশিতে যখন তারা আসে, প্রবেশ করে জনপদে তখন চারদিকে মেষের স্বভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। নেকড়েরাও জাতির মেষপর্বে অভিনন্দিত হয়; এ বাঙলায়ই কেউ কেউ অভিনন্দনও জানিয়েছিলো তাদের শয়তানের কোনো ধর্ম নেই, নিজের স্বার্থে সে ধর্মগ্রন্থ থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। এরা যখন এসেছিলো, তাই করেছিলো, অনেক শ্লোক আবৃত্তি করেছিলো; বাঙালিকে বুঝিয়েছিলো যে তাদের ত্রাণ করার জন্যে, সংকটকালে পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্যে তারা অনিচ্ছায় জনপদে এসেছে। নেকড়েদের জনপদে আগমন ও প্রতিষ্ঠার যতো সূত্র রয়েছে, একের পর এক তারা তা পালন করেছে। প্রথমে তারা কিছু দুর্নীতিপরায়ণকে কারাগারে পাঠায়, পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কারাগার থেকে তাদের বের ক'রে এনে সুনীতিপ্রচারের কাজে লাগায়। দেশের সমস্ত অসৎকে খুঁজে বের ক'রে মন্ত্রী অর্থাৎ ভৃত্যে পরিণত করে। তারা নেকড়ে গণতন্ত্র (গণতন্ত্রের এমন দুরবস্থা হয়েছে যে আজকাল নেকড়েরাও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে) শুরু করে, যার মূলকথা হচ্ছে নেকড়েরা নির্বাচিত করবে নেকড়েদের; অর্থাৎ কোনো ভোটার লাগবে না কিন্তু প্রত্যেক নেকড়ের বাক্স উপচে পড়বে ভোটে। নেকড়েতন্ত্রে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে;—যাকে তাড়া করার কথা জনগণের, তাকে তাড়া না ক'রে অনুসরণ করে। একটি মারাত্মক সত্য থাকে গোপনে। যদি দেখা যায় কোনো নেকড়ে সারা জাতিকে ত্রস্ত ক'রে রেখেছে, তখন বুঝতে হবে যে ওই জাতির অনেকে ওই নেকড়ের সহযোগী বা দালাল। বাঙলাদেশে গত এক দশক ধ'রে তাই হয়েছে; চিরকালই তা হয়েছে। বাঙলায় নেকড়েরা সহজেই পায় সহযোগী, এক দশক ধ'রে সহযোগী পেয়েছে ব'লেই টিকে আছে নেকড়েরা। নটি বছর ধ'রে অন্ধকারে আছি-অন্ধকার যুগে আছি; এ-ন-বছরে আমাদের সমস্ত ভালো ও ভবিষ্যৎ সংশোধিত হয়ে গেছে। আমাদের স্বাধীনতা সংশোধিত হয়েছে; গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সংশোধিত হয়েছে। আলোর সমস্ত রেখা মুছে ফেলা হয়েছে দেশ থেকে। জাতিকে ক'রে তোলা হয়েছে দুশ্চরিত্র। একটি সংবিধান লিখেছিলো বাঙালি; সেটিকে ন-বছরে নোংরা কাগজে পরিণত করেছে

www.BDeBooks.Com

তারা। জাতিকে ঠেলে নিয়ে গেছে মধ্যযুগে, উসকে দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। তারা এসেছিলো জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, জাতির কাছে তারা যে-শপথ করেছিলো, তা তারা রক্ষা করেনি। নেকড়েরা আসে, এবং চ'লে যেতে বাধ্য হয়। তারা সহজে যায় না; অনায়াস মাংসের স্বাদ পাওয়ার পর বিদায় নিতে ইচ্ছে করে না। তবে কোনো জাতিই চিরকাল মেষ হয়ে থাকতে পারে না, মানুষ হয়ে এক সময় জেগে ওঠেই। তখন আসে নেকড়েদের বিদায়ের পালা। নেকড়েদের শক্তি তাদের হিংস্র নখর; যাওয়ার আগে তারা নখরের প্রচণ্ড ব্যবহার ক'রে যায়। বাঙালি নেকড়ের নখের আঁচড় ভোগ করেছে উনসত্তরে, ভোগ করেছে একাত্তরে। ভোগ করেছে সাতাশিতে, ভোগ করছে নব্বইয়ে। কিন্তু তাদের যেতে হবে, দলবল নিয়ে যেতে হবে; তাদের সময় পেরিয়ে গেছে। আশির দশকটি নেকড়েদের দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিশশতকের শেষ দশকটি আসতে আর বাকি নেই; এক মাস পাঁচ দিন পরেই আসবে বিশশতকের শেষ দশকটি। আমরা চাই ওই দশকটির গায়ে যেনো নেকড়েদের নখরের দাগ না লাগে। এর আগেই তাদের বিদায় নিতে হবে; –বাঙালির জীবনের নতুন দশকের একটি মুহূর্তও যেনো নেকড়েদের স্পর্শে কলঙ্কিত-রক্তাক্ত না হয়। বিশশতকের শেষ দশকটিকে বাঙালি শুভ দশকরূপে পেতে চায়।

নেকড়ের রাজত্বে যদি মেষেরা নিরামিষাশী প্রস্তাব পাশ করে, আর নেকড়ে যদি ওই প্রস্তাবের সাথে পোষণ করে দ্বিমত, তবে ওই প্রস্তাব হয়ে ওঠে নিরর্থক। নিরামিষাশিতার প্রস্তাব হাস্যকর নেকড়ের কাছে; ওই প্রস্তাব তার কাছে গ্রহণ অযোগ্য। কোনোদিনই কোনো নেকড়ে প্রস্তাব শুনে পালায় নি জনপদ থেকে, নেকড়ে পালায় যদি দেখে মেষেরা রূপান্তরিত হয়েছে, যদি দেখে মেষেরা এগিয়ে আসছে অবিশ্বাস্য উদ্ধত শিং নিয়ে। নখর বোঝে শুধু শিংয়ের ভাষা। জনগণের শিং কোথায়? জনগণের শিং হচ্ছে তাদের ঐক্য, তাদের ঘৃণা, তাদের বিদ্রোহ। নেকড়েদের বিতাড়নের তিনটি উপায় আছে : প্রথমটি গণঅভ্যুত্থান, দ্বিতীয়টি গণঅভ্যুত্থান, ও তৃতীয়টি গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থানে দরকার নেকড়ে বিরোধী দলগুলোর পাথুরে ঐক্য, সামান্য অনৈক্যে গণপ্লাবন শুকিয়ে যেতে পারে। গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে জনগণের দীর্ঘ ক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণ;– ওই বিস্ফোরণ মাসের পর মাস ধ'রে চলতে পারে না। জনতার সাথে প্লাবন, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্পের মিল রয়েছে। প্লাবন, ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প মাসের পর মাস ধ'রে চলতে পারে না। অনেক দিন ধ'রে গোপন প্রক্রিয়ায় গণরোষ পুঞ্জীভূত হ'তে থাকে, যোগ্য নেতৃত্ব জানে কখন বিস্ফোরিত করতে হবে ওই ভয়ানক পারমাণবিকতাকে। যদি অসময়ে–সময় আসার আগে বা সময় চ'লে যাওয়ার পরে - বিস্ফোরিত করা হয় গণপারমাণবিকতাকে, তবে সব কিছু নিষ্ফল হয়; জাতির জীবনে নেমে আসে নতুন দুর্ভাগ্য। সাতাশিতে দেখেছি একটি অসামান্য বিস্ফোরণ-সম্ভাবনার অপব্যবহার। এবার আবার সারা জাতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি এবার আবার বিস্ফোরিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত। সারা দেশ জুড়ে বিস্ফোরিত করতে হবে বাঙালিকে, অর্থাৎ ঘটাতে হবে গণঅভ্যুত্থান। কী করতে হবে, তার উদাহরণ পাই বাঙালির অনতিঅতীতেই। ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি ঘটানোর সময় এসে গেছে। উনসত্তরের

পুনরাবৃত্তি ঘটানো যেতে পারে, বা আরো ভালো হয় যদি পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় একাত্তরের মার্চের প্রথম সপ্তাহগুলোর। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিরোধী দলগুলোর বোঝা উচিত তাদের যদি কোনো ভবিষ্যৎ থাকে, জাতির প্রতি যদি কোনো দায়িত্ব থাকে তাদের, তবে তা বাস্তবায়ন ও পালনের এটাই শেষ সুযোগ। এ-ধরনের বিদ্রোহ যাত্রাভিনয় নয় যে যখন ইচ্ছে তখন মঞ্চস্থ করা যাবে। নেকড়েরা এখন শুধু অপেক্ষা করছে জাতির প্রচণ্ড ক্ষোভের সময়টুকু কেটে যাওয়ার। যদি একবার তা কেটে যায়, তবে প্লাবন পরিণত হবে করুণ ভাটায়, প'ড়ে থাকবে ভাঙা কাঠ, নষ্ট বাঁশ, বালি লাশ। তখন নেকড়েদের নৃশংসতা হবে অপ্রতিরোধ্য। তাই বিরোধী দলগুলোকে এবার শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। ভাবতে হবে ভবিষ্যতের কথাও। গণঅভ্যুত্থান যদি ঘটে, নেকড়েরা যাবে; কিন্তু তারপর কী? দলগুলোকে জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা ভবিষ্যতে মেনে চলবে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমস্ত ব্যাকরণ। তাদের শপথ করতে হবে যে তারা কখনো নেকড়ে হয়ে উঠবে না। পৃথিবী ভ'রে দেখা গেছে যে আজকের বিদ্রোহী হচ্ছে আগামী কালের স্বৈরাচারী। তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা আগামী কালের স্বৈরাচারী ও লুঠেরা হয়ে উঠবে না। আমরা যে-গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছি, তা কোনো বিশেষ দলের সিংহাসনে আরোহণের স্বপ্ন নয়, তা বাঙালি জাতির মুক্তির স্বপ্ন। বাঙলাদেশ কোনো দল বা সংঘের নয়, বাঙালির।

www.BDeBooks.Com

বাঙলাদেশ একটি জাতীয় সরকার চায়

বাঙলাদেশ স্বৈরাচারের পতন চেয়েছিলো, গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্যে একটি নিরপেক্ষ অরাজনীতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছিলো; আজ বাঙলাদেশ একটি জাতীয় সরকার চায়। বাঙলাদেশের এ-চাওয়া এখন অনেকের মুখ থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, যতোই দিন যাবে ততোই উচ্চারিত হবে যে বাঙলাদেশ এখন চায় একটি জাতীয় সরকার। গণতন্ত্রে উত্তরণের, গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্ত করার জন্যে এই এখন একমাত্র উপায়। এখনি ক্ষমতায় যেতে হবে, ক্ষমতা থেকে দূরে থেকে থেকে আর ঘুম হচ্ছে না, এমন রক্তচাপ আর অনিদ্রায় যদি অসুস্থ হয়ে প'ড়ে থাকে কোনো দল, তবে তার সম্পর্কে বিশেষ সাবধান ও তার চিকিৎসা হওয়া দরকার। বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের কোনো সুস্থ ঐতিহ্য গ'ড়ে ওঠে নি, গড়ে ওঠেনি গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ; এর কারণ দশকের পর দশক ধ'রে এ-অঞ্চলে চলেছে গণতন্ত্রবিরোধী স্বৈরাচারের ধারা। এ-দেশের মানুষ আইউব থেকে এরশাদকে ঘেন্না করেছে, অনেক রক্তের মূল্যে তাদের তাড়িয়েছে; কিন্তু কোনো সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দীক্ষিত হ'তে পারে নি। বাঙলাদেশ কোনো দলের ওপরই সম্পূর্ণ আস্থা পোষণ করার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আসে নি; বাঙলাদেশ কোনো একক দলের কাছেই আত্মসমর্পণ ক'রে স্বস্তি বোধ করার মতো নিশ্চয়তা পায় নি। বাঙালি নিয়মিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায় নি, তাই ভেবেচিন্তে ভোট দেয়া এখনো আসে নি বাঙালির স্বভাবের মধ্যে। অধিকাংশ সময় তাদের ভোটই চুরি হয়ে গেছে; তারা ভোট না দিলেও ক্ষমতাসীন প্রার্থীদের বাক্স উপচে ভোট পড়েছে; তবে দু-বার বাঙালি ভোট দিয়েছে প্রবল জাতীয় আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে। সে-দুবারই বাঙালি ঘটিয়েছে মহাঘটনা। অধিকাংশ বাঙালিই দলগুলোর কর্মসূচিও—যদি কিছু থাকে—জানে না, তাদের কর্মসূচিতে বিশ্বাস করা বেশ দূরের কথা। যে-সব দলের অধীনে বাস করেছে বাঙালি, তাদের চিনেছে হাড্ডিতে হাড্ডিতে। এখন বাঙালি কোনো একক দলের ক্ষমতার ছুরিকার নিচে বাস করতেই ভয় পায়। লঙ্কায় পৌঁছোনোর পর রামের পক্ষেও রাবণ হয়ে ওঠা এদেশে অস্বাভাবিক নয়, খুবই স্বাভাবিক; তাই তা বাঙালির জাতীয় প্রবাদ। এখন একটি সুস্থির কলহহীন গণতন্ত্রের -জন্যে-প্রস্তুত বাঙলাদেশ সৃষ্টি করা দরকার; আর ওই বাঙলাদেশের জন্যে দরকার একটি জাতীয় সরকার। একটি অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার চালাচ্ছে এখন বাঙলাদেশ; বাঙালি এখন যে-জাতীয় সরকারের কথা ভাবছে, সেটিও হবে একধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার কাজ হবে বাঙলাদেশের শরীর থেকে স্বৈরাচারের ছাপ পুরোপুরি মুছে ফেলা, তার মন থেকে স্বৈরাচারের সমস্ত কলুষ পরিচ্ছন্ন করা, দেশকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্যে

প্রস্তুত করা। এ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দলগুলো নিজেরাও হয়ে উঠবে গণতান্ত্রিক, মানুষের জন্যে ত্যাগ করতে শিখবে স্বার্থ, পেশির বদলে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে শিখবে কল্যাণমুখি কর্মসূচিকে। এ-প্রক্রিয়ায় দলগুলো মুক্তি পাবে পেশল মাস্তান ও লোলুপ রাজনীতিকদের কবল থেকে, রাজনীতিকেরা শিখবেন দায়িত্ববোধ বা রাজনীতি। আগাছা দলগুলোর পুলকিত বিকাশের রোগ থেকেও মুক্তি পাবে বাঙলাদেশ। যদি আমাদের দলগুলো একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে পারে, তবে গঠন করবে তারা তাদের নিজেদের ও বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ। ছাত্রদের ঐক্য যদি ভেঙে যায়, দেশ যদি মেতে ওঠে ক্ষমতায় যাওয়ার দলাদলিতে, তবে রাজনীতিক অস্থিরতা গ্রাস করতে পারে জাতিকে; এবং জাতি আবার ডুবতে পারে অন্ধকারে। আবার বাঙলা জুড়ে অন্ধকার কেউ চাই না; বাঙলাকে রাখতে চাই পরিপূর্ণ আলোকিত। বাঙলাদেশকে আলোকিত রাখার উপায় হচ্ছে সর্বসম্মতিক্রমে একটি জাতীয় সরকার সৃষ্টি করা। এখনো বাঙালির মনে ভয় জড়ো হয়ে আছে; সে-ভয় শুধু অতীতের ভয় নয়, ভবিষ্যতেরও ভয়। যে-ভবিষ্যৎ চাই আমরা, তা কোনো একক দলের পক্ষে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব; বরং সম্ভব ভবিষ্যৎকে বিনষ্ট করা। বাঙলাদেশের একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যেই এখন বাঙলাদেশের দরকার, ও বাঙলাদেশ চায়, একটি জাতীয় সরকার।

কীভাবে গঠিত হবে জাতীয় সরকার? দলগুলো কোথাও ব'সে মিলেমিশে এটা গঠন করবে, ক্ষমতায় যাবে, বৈধ হবে না। দেশে দলেরও কোনো শেষ নেই, আর দিগন্তে এমন সোনালি রেখা দিলে একদিনে কয়েক শো দল রাজনীতিব্যবসায়ীদের গর্ভ থেকে আবির্ভূত হবে। নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠন করতে হবে জাতীয় সরকার। শুধু নির্বাচনে জয়পরাজয়ের নিয়মটা কিছুটা বদলে দিতে হবে। প্রচলিত গণতন্ত্রে পাশ মানে পাশ, আর ফেল মানে ফেল; মাঝামাঝি কিছু নেই। পাশ-ফেলের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, মোট ভোটের পরিমাণ অনুসারে জাতীয় সরকার গঠন করা কঠিন ব্যাপার নয়, যদিও কঠিন হচ্ছে জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছানো। শতকরা পনেরো থেকে আরো বেশি ভোট পাবে যে-সব দল, সে-সব দল গঠন করবে জাতীয় সরকার। ভোটের হার অনুসারে হবে সংসদে ও মন্ত্রীসভায় দলগুলোর সদস্যসংখ্যা, এমন একটি নীতিতে সম্মত হওয়া কঠিন নয় যদি আমরা ক্ষমতার জন্যে উন্মত্ত না হয়ে থাকি। তবে মনে রাখা খুবই উপকারী হবে যে ক্ষমতা চিরকাল কারো মুঠোতে থাকে না, ক্ষমতা খুবই পিচ্ছিল প্রতারক বস্তু;—তা মহানায়কের মুঠোতেও চিরকাল থাকে না, একনায়কের মুঠোতেও চিরকাল থাকে না। কতো দিনের জন্যে গঠিত হবে জাতীয় সরকার? বছর তিনেক সময় দেয়া যেতে পারে এ-সরকারকে। জাতীয় সরকার প্রথাগত ক্ষমতাসম্ভোগের বা লুঠতরাজের সরকার হবে না, টেলিভিশনে নিজেদের চর্বিশোভিত মুখ দেখানোর জন্যে এ-সরকার হবে না, এর কাজ হবে গত ন-বছরের সমস্ত দুর্নীতির বিচার করা, এর কাজ হবে জাতিকে গণতান্ত্রিক ক'রে তোলা, এর দায়িত্ব হবে দেশের ভাঙা অর্থনীতিক মেরুদণ্ডটিকে জোড়ালাগানো; এর কাজ হবে দেশে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, এর দায়িত্ব হবে দেশকে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে উদ্ধার ক'রে তাকে প্রগতিতে পুনর্বাসিত করা। আমাদের সরকারগুলো নিজেদের দায়িত্ব

www.BDeBooks.Com

বলতে যা বোঝে, তার কোনোটিই জাতীয় সরকারের দায়িত্ব হবে না; অর্থাৎ জাতীয় ব্যবস্থাপকদের ক্যামেরার মুখোমুখি অভিনয় করতে হবে না– দেশে খাঁটি ভাঁড়ের অভাব নেই, অভিনয়ের দায়িত্ব তাঁরাই পালন করবেন; ব্যবস্থাপকদের লুঠতরাজে মত্ত হ'তে হবে না, লিপ্ত হ'তে হবে না চোরাকারবারে; ব্যবস্থাপকদের আমদানীর পারমিট, ব্যাংকের ঋণ, অজস্র উৎকোচে জড়িত থাকতে হবে না; ব্যবস্থাপকদের ছুটতে হবে না মাজার থেকে মাজারে ভণ্ড পীরের পায়ে, পরিশ্রান্ত হবে না স্তুতিকলায়; অর্থাৎ আমাদের ব্যবস্থাপকেরা তাঁদের প্রথাগত দায়িত্ব বলে যা-কিছু গণ্য করেন, তার কিছুই করতে হবে না তাঁদের। আমরা আশা করবো এসব প্রথাগত দায়িত্বপালনের জন্যে যারা ব্যগ্র হয়ে আছেন– অনেকেই আছেন– তাঁরা বিদায় নেবেন, জাতীয় সরকার তাঁদের জন্যে উপকারী হবে না। এও জানি প্রথাগত এসব বিষয়ে যাঁদের উৎসাহ অপার তাঁরাই বাদ সাধবেন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায়। গণঅভ্যুত্থানের অগ্রপথিক যারা, সে-ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় সরকারের রূপরেখা ও শ্লোগান নিয়ে; তাহলেই তা ঢুকবে রাজনীতিকদের দৃষ্টিতে ও শ্রুতিতে। এগিয়ে আসতে হবে জনসাধারণকে, যাদের কণ্ঠস্বর বা মুখচ্ছবি কোনো সম্প্রচার মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয় নি, যারা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় নি, কিন্তু যারা এক দশকের স্বৈরাচারকে ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছে। বাঙলাদেশ এতোদিন স্বৈরাচারের পতন চেয়েছে, এখন একটি জাতীয় সরকার চায়।

গণতন্ত্রের তীর্থে কারা যান

গণতন্ত্র বুর্জোয়াদের তন্ত্র; আর বুর্জোয়াদের বিধাতার নাম টাকা। তাই গণতন্ত্রে টাকার লীলার কোনো শেষ নেই। গরিব বাঙলাদেশ এখন গণতন্ত্রের দিকে যাত্রা করছে, চারদিকে শোনা যাচ্ছে টাকার উপাখ্যান; টাকাই বাঙলাদেশকে পৌঁছে দেবে গণতন্ত্রের তীর্থে। যার টাকা নেই তার গণতন্ত্রের তীর্থে পৌঁছোনোর কোনো সম্ভাবনা নেই, তাকে চিরকাল হয়ে থাকতে হবে শক্তির অক্ষম উৎস; যার টাকা আছে তিনি হবেন শক্তির সুশোভিত পরিণতি। তিনি সংসদে যাবেন, বঙ্গভবনে যাবেন, সচিবালয়ে প্রভু হবেন; যার টাকা নেই সে শুধু একটি মূল্যবান ভোট দিয়ে (যদি সম্ভব হয়) গণতন্ত্র উপভোগ করবে। বাঙলাদেশে টাকা আছে কার? ভিখারির টাকা নেই, চাষীর টাকা নেই, শ্রমিকের টাকা নেই, অধ্যাপকের টাকা নেই, বুদ্ধিজীবীর টাকা নেই। তাই তাঁরা কেউ নেতা হবেন না, কখনো তাঁরা অর্জন করবেন না গণতন্ত্রের তীর্থে পৌঁছোনোর পুণ্য। কিছু কিছু আমলার টাকা আছে; তাঁরা জনসেবার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদেরও সেবা করেছেন। তাঁরা ইচ্ছে করলে, অবসর নেয়ার পর, জনগণকে আরো সেবা করার জন্যে গণতন্ত্রের তীর্থে যেতে পারেন; অনেকেই যাবেন। তাঁরা অবশ্য স্বৈরতন্ত্রের তীর্থে যেতেই বেশি পছন্দ করেন; স্বৈরাচারীদের সভা সব সময়ই আমলারত্নে ঝলমল করে– এরশাদের মুকুট সুশোভিত ছিলো উজ্জ্বল আমলারত্নাবলিতে। এখন তত্ত্বাবধায়কের মুকুটও আমলার শোভায় দেদীপ্যমান। বাঙলার ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রও আমলাশোভিত হবে। বাঙলাদেশে সামরিক আমলারা স্বৈরতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে সমান বিশ্বাসী; এক সময়ে তাঁরা বুট প'রে জাতির সেবা করেন, তারপর স্যুট প'রে গণতন্ত্রের চর্চা করেন। তাঁদের টাকা আছে গণতন্ত্রের তীর্থে যাওয়ার। আইনজীবীদেরও টাকা আছে, তাই তাঁরাও, এবং তাঁরাই বেশি ক'রে গণতন্ত্রের তীর্থে যান। দেশে রয়েছেন ঝাঁকঝাঁক পেশাদার রাজনীতিক, তাঁদের টাকা আসে কোথা থেকে জানা যায় না;' তবে তাঁরা ক্ষমতাসীনদের দালালি, ব্যবসাবাণিজ্য, ও ব্যবসায়ীদের দানে ধনপতি হয়ে থাকেন ব'লে জনগণ বিশ্বাস করে। গণতন্ত্রে উঠেপ'ড়ে নামে নানা ধরনের ব্যবসায়ীরা, যাদের টাকাপয়সার প্রায় সবটাই নানা রকমের দুর্নীতি থেকে অর্জিত। এখন কোন ব্যবসায়ী কোন দলকে কতো কোটি টাকা দিয়েছে; তার নানা কাহিনী শোনা যায়। জাতীয় পার্টির লোকেরা গত ন-বছরে কোটি কোটি টাকা করেছে; তারা এখন, শোনা যায়, সে-টাকার কিছু অংশ বিলিয়ে দিচ্ছে গণতন্ত্রের উৎসবকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্যে। জাতীয় পার্টির ক্ষতিকর লোকগুলোকে যে ধরা হচ্ছে না, তার বড়ো কারণ সম্ভবত তারা এতোদিন স্বৈরতন্ত্রের সেবা করলেও এখন কোটি কোটি টাকা দিয়ে তারা গোপনে

www.BDeBooks.Com

গোপনে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ পরিচ্ছন্ন করছে। টাকার মতো পুণ্য আর নেই, টাকা মানুষের পাপ মুছে দেয়; এক কোটি টাকা এক হাজার বছরের আরাধনার সমান। টাকা আছে, তাই শিগগিরই দেখা যাবে যে জাতীয় পার্টির শয়তানেরা হয়ে উঠেছে গণতন্ত্রের ফেরেশতা। এককথায় দেশে টাকা আছে তাদের, যারা দেশের ও জনগণের জন্যে ক্ষতিকর; যাদের অধিকাংশই সততা, ন্যায়, নীতি প্রভৃতি থেকে অনেক দূরে বাস করে, এ-জীবনে যাদের সৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়, তাদের কোনো রাজনীতিক বিশ্বাসও নেই। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তবে এখন যেহেতু গণতন্ত্রের কাল, তাই তারা গণতন্ত্রের চর্চায় নেমেছে; আবার কখনো যদি সময় বদলে যায় তখন তারা অন্য কোনো তন্ত্রের তপস্যায় মগ্ন হবে। এখন জাতীয় পার্টির অশুভ ব্যক্তিরা দুটি বড়ো দলে যোগ দিচ্ছে; ওই দল দুটি তাদের প্রতিহত করছে না নিজেদের স্বার্থে, এবং এভাবেই তারা বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ ক'রে দিচ্ছে অশুভর পায়ে।

আমাদের দুর্গতির বড়ো কারণ হচ্ছে রাজনীতিতে সৎ, রাজনীতিক আদর্শে বিশ্বাসী ও মেধাবী মানুষের অভাব। যে-মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সৎ নয়, তার হাতে দেশের ভার পড়লে সে দেশকে অসততায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবেই। এটা আর নতুন ক'রে প্রমাণের বিষয় নয়; বাঙলায় এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। রাজনীতিকদের অসততার ফলে বাঙলা ভাষায় 'রাজনীতি', 'রাজনীতিবিদ' শব্দের অর্থই পতিত হয়েছে। অসততা আমাদের দেশে প্রধানত আর্থিক; সমস্ত দুর্নীতিই আর্থিক দুর্নীতি। ক্ষমতায় গেছে অথচ অসৎ উপায়ে টাকা করেনি, এমন মানুষ পাওয়া বাঙলায় খুবই কঠিন। রাজনীতিকেরা এমন একটি প্রজাতি, যারা জন্মসূত্রেই ক্ষমতাপ্রবণ; ক্ষমতা তাদের সুখী করে। কিন্তু তাদের থাকা দরকার বিশেষ রাজনীতিক বিশ্বাস, যা আমাদের দেশে দুর্লভ। বিশ্বাসহীন ক্ষমতালোভ যাদের রাজনীতিক বিশ্বাস, যা আমাদের দেশে দুর্লভ। বিশ্বাসহীন ক্ষমতালোভ যাদের রাজনীতিকে পরিণত করে, তারা দেশকে পরিণত করে নরকে; আমাদের দেশে তাই হয়ে থাকে। এখন যারা গণতন্ত্রের জন্যে প্রমত্ত, তারা অধিকাংশই জানে না গণতন্ত্র কী; তাই তাদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস পোষণ করার কথাই ওঠে না। অথচ এরাই যাবে গণতন্ত্রের তীর্থে; এরাই দেশে বাস্তবায়িত করবে স্বপ্নের গণতন্ত্র। তারা আসলে চায় ক্ষমতা, গণতন্ত্র নয়; তারা ক্ষমতা চায়, কেননা ক্ষমতার সাহায্যেই তারা অবৈধ টাকা অর্জন করতে পারবে। যারা গণতন্ত্রে যাবে, তাদের মেধাও লক্ষ্য করার বিষয়। মেধাবীরা সাধারণত দলীয় রাজনীতিতে যায় না; কোনো জাতিই আশা করে না যে তার শ্রেষ্ঠ মেধারা রাজনীতিতে গিয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট করুক। যারা হবে বিজ্ঞানী বা প্রকৌশলী বা দার্শনিক বা কবি অর্থাৎ সভ্যতার স্রষ্টা, তারা যদি রাজনীতিতে গিয়ে নষ্ট হয়, তাহলে মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। নিউটন বা আইনস্টাইন [তাঁকে ইসরাইলের প্রথম রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিলো, তিনি রাজি হন নি] বা রবীন্দ্রনাথ যদি দলীয় রাজনীতিতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী বা 'মহাত্মা' হতেন, তাহলে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা- সম্মান বেশি উপভোগ করতেন, কিন্তু মানব জাতির জন্যে তা হলো ক্ষতিকর। তাই জাতির শ্রেষ্ঠ মেধাপ্রতিভারা সৃষ্টিশীল

কাজে থাকবেন, তাই সবাই চায়। রাজনীতির জন্যে দরকার মাঝারি বা নিম্নমাঝারি মানের মেধা; আমাদের দেশে তাও দুষ্প্রাপ্য। এখানে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের সময় দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে মোটাঘিলু জেনারেলেরা; আর গণতন্ত্রের সময় দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে মেধাহীন রাজনীতিকেরা, যা জাতির জন্যে চরম দুর্ভাগ্যজনক। এবারে গণঅভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ছাত্ররা, বুদ্ধিজীবীরা ও সাধারণ মানুষেরা। এরা কেউ গণতন্ত্রের তীর্থে যাবে না; দেশের সৎ, সাহসী, রাজনীতিক বিশ্বাসী ও মেধাবী অংশটি সংসদে যাবে না, যাবে তারা যাদের বড়ো অংশের মূলধন টাকা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে তারা, যারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; যাদের সম্বন্ধে সন্দেহের শেষ নেই আমাদের গণতন্ত্র যেহেতু পশ্চিমের খাঁটি গণতন্ত্র হবে না, তাই দেখা যাবে সমাজের কম মেধাবী, কম সৎ অংশটি নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের থেকে উৎকৃষ্টদের। মেধা ও সততাকে রোধ করা হয় কীভাবে, তার উদাহরণ রয়েছে বাঙলাদেশের সংবিধানেই। সংবিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতিক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার দেয় নি। ফলে কোনো শিক্ষক সংসদে যাবেন না, কিন্তু সংসদে যাবে সিনেমা হলের মালিক, ঠিকাদার, মুনাফাখোর, টাউট, যাদের সততা ও রাজনীতিক বিশ্বাসের অভাব সীমাহীন। তারা যে গণতন্ত্র উপহার দেবে, তার মুখের দিকে তাকানো যাবে না। টাকা সব কিছু কিনতে পারে; টাকা গণঅভ্যুত্থানকেও কিনতে পারে, আর গণতন্ত্রকে তো কিনতে পারে অত্যন্ত শস্তায়।

www.BDeBooks.Com

মিছিলের মানুষ

যখন মানুষ একা, তখন সাধারণ; যখন মানুষ মিলিত ও সংহত, তখন অসাধারণ। একা মানুষ নিঃসঙ্গ, মলিন, অসহায়;' মিলিত মানুষ নির্ভয়, জ্যোতির্ময়, শক্তিমান। তৃতীয় বিশ্বে মানুষ অসংখ্য; সব কিছুরই অভাব পৃথিবীর তৃতীয়াংশে, অভাব নেই শুধু মানুষের; এবং এখানেই মানুষের দাম সবচেয়ে কম। সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থিক পাথরের নিচে শতকের পর শতক ধ'রে পিষ্ট হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দুঃস্থ মানুষ; তাদের মাংস থেঁৎলে গেছে, মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে; কিন্তু তারাই লড়াই ক'রে চলছে আধুনিক কালের সব রকম দানবদের বিরুদ্ধে। পৃথিবীকে ত্রাণের ভার যেনো পড়েছে তাদেরই ওপর; মনুষ্যত্বের অপমান মুছে ফেলার দায়িত্ব যেনো তাদের, যারা সবচেয়ে অপমানিত। তাদের পাকস্থলিতে সবচেয়ে অপুষ্টিকর খাদ্য, অনেকের পাকস্থলিতে কোনো খাদ্যই পড়ে না; তাদের পোশাক ছেঁড়াফাড়ানোংরা, অনেকের আবার পোশাকই নেই; তাদের ঘরবাড়ি ঘিনঘিনে নড়োবড়ো, অনেকের আবার ঘরবাড়িই নেই। সামাজিক-রাজনীতিক শোষণে রক্তহীন তারা; তারা যে বেঁচে আছে, এটাই বিস্ময়কর। কিন্তু এই মানুষই যখন উঠে দাঁড়ায়, রুখে দাঁড়ায়, তখন তার মাথা হয়ে ওঠে পর্বতের মতো উদ্ধত; এই মানুষ যখন জ্বলে ওঠে, তখন তার আগুন হয়ে ওঠে দাবানলের থেকেও বিপজ্জনক; এই মানুষ যখন বিস্ফোরিত হয় তখন তার তাপ হয়ে ওঠে পারমাণবিক বোমার থেকেও ভয়াবহ; এই মানুষ যখন মিছিলে নামে তখন তার কম্পন হয়ে ওঠে ভূমিকম্পের থেকেও আলোড়নজাগানো; এই মানুষ যখন প্রবাহ হয়ে নামে তখন তার প্লাবনে ভেসে যায় স্বৈরাচারের মতো অশ্লীল সব দানবিক দুর্গ। সাধারণ বাঙালির কথাই ধরা যাক– খুবই সাধারণ তারা অসাধারণদের থেকে। অসাধারণদের শোভার শেষ নেই, শক্তিরও শেষ নেই, সৌন্দর্যও জমকালো; আর সাধারণেরা গরিব, মলিন, প্রভাহীন; রাস্তার ধুলোবালির মতো ছড়িয়ে আছে তারা। বুট তাদের ভয় দেখায়, উর্দি তাদের ভয় দেখায়; কোনো সংরক্ষিত তোরণ দিয়ে ঢুকতে পারে না তারা। এমনকি পথের মাঝ দিয়েও তারা চলতে পারে না। কিন্তু এই সাধারণ বাঙালিই যখন পথে নামে, মিছিল হয়ে ওঠে, দাবানল প্লাবন ভূমিকম্প পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়ে ওঠে, তখন হয়ে ওঠে অসাধারণ। তখন তাদের মাথা নীলিমা স্পর্শ করে, সমস্ত অসাধারণেরা খর্ব বামন হয়ে ওঠে তাদের পাশে। ১৯৯০ দেখেছে সেই অসাধারণ মানুষদের, বাঙালিদের, যাদের পায়ের নিচে পোকামাকড়ের মতো বিলীন হয়ে গেছে বিশাল দেহের পরিপুষ্ট দানবেরা। বাঙলাদেশে আশির দশকটি ছিলো দানবদের দশক, কিন্তু দশকের শেষ বছরটি হঠাৎ হয়ে উঠলো মানুষের উত্থানের বছর, মানুষের বছর, সাধারণ মানুষদের অসাধারণত্বের বছর। যে-মানুষ এক দশক ধ'রে ছিলো মনুষ্যেতর, যাদের কোনো মূল্য ছিলো না, যারা বুটের

নিচে ক্ষতবিক্ষত পলিমাটির মতো প'ড়ে ছিলো, যাদের ওপর দিয়ে বছরের পর বছর ধ'রে দানবিক চাকা চালিয়েছে স্বৈরাচার, যাদের নিষ্প্রাণ ক'রে দেয়ার জন্যে চক্রান্তের শেষ ছিলো না কোনো, হঠাৎ নব্বইয়ে অলৌকিক মহাজাগরণ ঘটে তাদের। নব্বই তাই মহামানবের মহাজাগরণের মহাবর্ষ। তাদের উদ্দেশ্যে 'ওই মহামানব আসে' ব'লে কোনো সঙ্গীত গীত হয় নি, তারা এমনভাবে আসবে তাও ভাবতে পারে নি কেউ; কিন্তু তাদের আসার পর বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় কীভাবে হঠাৎ এলো এই মহামানব। নব্বই সাধারণ মানুষের মহামানবে পরিণত হওয়ার বছর। বাঙলাদেশের ইতিহাসে বায়ান্নো আর একাত্তরের মতোই জ্যোতির্ময় হয়ে থাকবে নব্বই। মানুষের পরাজয়ের কাহিনীতে ভরে আছে ইতিহাসের অসংখ্য পরিচ্ছেদ, মানুষের জয়ের কাহিনী বেশি নেই; মানুষের জয়ের ইতিহাসের নব্বই অত্যুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মানুষের এমন উত্থান সম্পর্কে সম্ভব নয় কোনো ভবিষ্যদ্বাণী; কারো পক্ষে অক্টোবরেও বলা সম্ভব ছিলো না যে বাঙলার সাধারণ মানুষেরা এমন অসাধারণ হয়ে উঠবে। আমরা মানুষের পরাজয় অনেক দেখেছি, দেখেছি জয়ের মুখোমুখি এসে গোপন চক্রান্তে মানুষের ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। হতাশাই বরং ঢুকে গিয়েছিলো জাতির মর্মে। মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্তের এখানে শেষ নেই; অভাব নেই এখানে দানবদের অনুচরের। দানবেরাও হয়ে উঠেছিলো আত্মবিশ্বাসী, বাঙলায় আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবেই দানবিক আর হতাশা-ব্যর্থতা মানবিক। আমরা বছরের পর বছর ধ'রে দেখেছি আমাদের সব কিছু নষ্টদের অধিকারে চ'লে যেতে, মাথা তুলে ভয়ঙ্করভাবে দিকে দিকে দাঁড়াতে দেখেছি অশুভকে, তাই শুভ সহজে আসবে এমন বিশ্বাস পোষণ করা কঠিন হয়ে উঠেছিলো। দানবদের বিশ্বাসই ছিলো অনেক দৃঢ় যে তারা টিকে যাবে আরেক দশক, বা যতোদিন তাদের ইচ্ছে, কারণ জানতো তারা যে দানবিক শক্তির উৎস তাদেরই হাতের মুঠোতে, এবং থাকবে চিরকাল। আমরা মানুষেই বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছিলাম, আস্থা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম দানবে, অসুরে। মানুষের শক্তিতে আমরা অনাস্থা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম, মানুষকে মনে করতে শুরু করেছিলাম জলবিন্দুর মতো খিন্ন। ভাবতে শিখছিলাম যে মানুষ সামান্য, আসহায়, পর্যুদস্ত; মনে করছিলাম মানুষ বড়োজোর আত্মোৎসর্গ করতে পারে, পথে নিজের ব্যর্থ শোণিত ছড়াতে পারে, শহীদ হ'তে পারে, কিন্তু তার বেশি পারে না। সব পারে দানবেরা, তাদের পেশিতে রয়েছে শক্তি; তাই দানবেরা সফল হবে, মানুষেরা হবে ব্যর্থ, এমন বিশ্বাস জড়ো হচ্ছিলো আমাদের মনে। মানুষের রক্ত কীভাবে ব্যর্থ হয়, তা দেখে আসছিলাম আমরা দানবদের আসার পর থেকেই। মানুষ বছরের পর বছর বারুদের খাদ্য হয়েছে, ট্রাকের পানীয় হয়েছে, রাস্তায় মানুষ নামপরিচয়হীন লাশ হয়ে প'ড়ে থেকেছে, মানুষ বছরের পর বছর পরাভূত হয়েছে; বিজয়ী হয়ে মুকুট পরেছে দানবেরা। দেশ জুড়ে তাদের বুটের শব্দ উঠেছে। তাদের হেলিকপটার উড়েছে। সারা দেশকে বৃশ্চিকের মতো ঘিরে ধ'রেছে দানবদের অনুচরেরা, দিকে দিকে ধ্বনি উঠেছে 'জয় জয় দানবের জয়'। মানুষের জয়ধ্বনি শোনা যায় নি কোথাও, মানুষের পরাজয়ের বেদনায় চারপাশ ছেয়ে গেছে। এ-বছরের মতোই আরেক বছর— সাতাশিতে— মানুষের জাগরণ ঘটেছিলো, আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো মানুষের মহাজাগরণের; কিন্তু

www.BDeBooks.Com

সেই মহাজাগরণকে পরিণত করা হয়েছিলো মানুষের করুণ পরাজয়ের ঘটনায়। সে-বছরও পথে পথে বেরিয়ে পড়েছিলো সাধারণ মানুষেরা, রাজপথকে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছিলো, ভূগোল বদলে দিয়েছিলো পথপ্রান্তরের, রাজপথে চালিত ক'রে দিয়েছিলো নিজেদের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন, নিজেদের রক্তে বদলে দিয়েছিলো রাজপথের রঙ; কিন্তু তবু ব্যর্থ হয়েছিলো সাধারণ মানুষ। তার পেছনে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা ছিলো, মানুষের বিপক্ষেই গিয়েছিলো মানুষের নেতারা? মিছিলের মানুষ কোনো কূটকৌশল জানে না, তারা কোনো গোপন প্রাসাদে যায় না, তারা কোনো দরাদরি জানে না, তারা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে সকলের স্বার্থ উৎসর্গ করে না; তারা জানে শুধু পথকে, জানে নিজেদের উৎসর্গ করতে। সাতাশিতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলো মিছিলের মানুষেরা, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলো এমন কোনো কারণে যা কখনোই ভালো ক'রে জানবে না মিছিলের মানুষেরা।

বাঙলায় সাধারণ মানুষের সামনে খোলা অপমৃত্যুর অসংখ্য পথ। তারা না খেয়ে মরে, তারা পথে নেমে দুর্ঘটনায় মারা যায়, তারা মরে লঞ্চডুবিতে, খড়কুটোর মতো তারা ভাসে বন্যায়, এবং খুন হয়ে যায় অনেকে অত্যন্ত সাধারণ কারণে। নব্বইয়েও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি; বছরের শুরু থেকেই তারা অসহায়ভাবে মরতে শুরু করে; তাদের খোঁজও রাখে না কেউ। দেশে রয়েছে ছাত্ররা; ছাত্ররা সব সময়ই শাসকদের জন্যে অস্বস্তিকর, এ-বছরও শুরু থেকেই তারা এখানে সেখানে ধর্মঘট ডেকে দানবদের জন্যে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে থাকে; কিন্তু কেউ ভাবে নি তারা বছরের শেষ দিকে হয়ে উঠবে এমন বিপজ্জনক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি অনেক দিন ধ'রেই নিন্দিত, তাদের নিন্দা করা হয়ে উঠেছে বুদ্ধিজীবীদের মননশীলতার উদাহরণ। কিন্তু এ-বছরটাকে বলা যায় মধ্যবিত্তদের বছর; নব্বইয়ের মিছিলের সাধারণ মানুষেরা প্রায় সবাই এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। কৃষক সাধারণত আন্দোলনে আসে না, বাঙলার কৃষক এখনো রাজপথে হাঁটতে শেখেনি, তারা থাকে শহর থেকে অনেক দূরে; তারা এখনো রাজা রাজ্য প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে বুঝে থাকে সমাজ রাজনীতি; এবং আপাদমস্তক ভেঙে প'ড়েও সন্তুষ্ট থাকে সব কিছু নিয়ে। এবার শ্রমিকেরাও আসে নি; বাঙলার শ্রমিকদের গত ন-বছরে নষ্ট করা হয়েছে অনেকখানি। একবার হরতালের হুমকি তারাও দিয়েছিলো, কিন্তু তা হুমকিই থেকে গিয়েছিলো; তবে তারা মাঝে মাঝে খুনোখুনি করেছে নিজেদের মধ্যে। এবার মধ্যবিত্ত এগিয়ে এসেছে : প্রথমেই এসেছে ছাত্ররা, তারাই থেকেছে মিছিলের সামনে। এসেছে বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষকেরা, চিকিৎসকেরা, এবং ছিলো রাজনীতিক দলগুলো, যদিও তারাই ছিলো সবার পেছনে তবে এখন ফলভোগের সময় তারা এগিয়ে গেছে সবার আগে। মিছিলে যারা কখনোই আসে না সেই চোরাকারবারিরা আসে নি, বনানী-গুলশান-ধানমণ্ডি থেকে কখনো মিছিল বেরোয় না; সুবিধা বুঝে যারা ঠিক সময়ে পদত্যাগ করে সেই আমলারা এসেছিলো সুবিধাজনক সময়ে, এখন তারা অনেক সুবিধা আদায় ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু ছিলো ছাত্ররা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলো; আর তারা ছিলো বলেই যুগান্তর ঘটেছে বাঙলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জড়িয়ে আছে বাঙলাদেশের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে, এটিই আমাদের যুগান্তরের উৎস। এরশাদসংঘের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ হয়েছিলো এখানেই, শেষ প্রতিবাদও এখানে।

যতোটা মনে আছে, তিরাশির শুরুতে এরশাদি শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আন্দোলন সংহত হয়েছিলো, পুলিশ নৃশংস ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছিলো কলাভবন জুড়ে, আর অনেক দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা জুড়ে জারি হয়েছিলো প্রখর সামরিক আইন। একাত্তরে যেমন লকলকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক ক'রে ঘুরতো সামরিক ট্রাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক দিনের জন্যে দানবেরা তেমন লকলকে ক্ষুধার্ত ট্রাক নিয়ে ঘুরতো। নব্বইয়ের শুরুতেই ফেব্রুয়ারিতে এরশাদের আজ্ঞাবহ উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে তোলে ছাত্ররা, পদত্যাগে বাধ্য করে তাকে; আর বছরের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু হয় এরশাদসংঘের পতনের সূচনা, পদত্যাগে বাধ্য করে আশির দানবকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যবিত্তের জ্ঞানের জননী, মধ্যবিত্তের সাহস ও সংগ্রামেরও জননী।

অনেক বছর ধ'রেই শীত ঘনিয়ে আসতে থাকলে বাঙলাদেশের রাজনীতিক জলবায়ু গনগনে হয়ে উঠতে থাকে। অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে কিছু না ঘটলে বোঝা যায় ওই বছর আর কিছু ঘটবে না। এবারও অক্টোবর আসতেই, শীতের কুয়াশার আভাস পাওয়ামাত্রই, রাজনীতিক জলবায়ু বোশেখি হয়ে ওঠে। সূচনা ঘটে দশই অক্টোবরে। উনসত্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো আসাদের বিদ্রোহী লাশ, এবার একই বিস্ফোরণ ঘটায় জাহিদের লাশ। সে ছিলো ছাত্র, আর ছাত্রদের লাশ সব সময়ই বাঙলায় বাতাসের স্তরেস্তরেও আগুন ধরিয়ে দেয়। জাহিদের লাশটি সেই কাজ ক'রে এবার বাঙলায়। তার লাশের শিখা থেকে জন্ম নেয় ছাত্রঐক্যের দাবানল, যা রাজনীতিক জোটগুলোকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। হরতাল হয়ে ওঠে বাঙলাদেশের জীবন; ঢাকার চৌরাস্তাগুলো হয়ে ওঠে অগ্নিগিরির জ্বালামুখের মতো। মানুষ নামে পথে। এরশাদসংঘ জানতো ছাত্ররাই তাদের বড়ো শত্রু; তাই আন্দোলনের সামান্য আভাসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ক'রে দেয়া ছিলো এরশাদসংঘের টিকে থাকার কৌশল। এবারও তাই করা হয়। কিন্তু এবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। তবে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ইতিহাস যদি রাজনীতিক দলগুলোর দখলে থাকতো, তবে আগের পরিচ্ছেদই আবার লেখা হতো; কিন্তু এবার ইতিহাস চ'লে গিয়েছিলো ছাত্র ও সাধারণ মানুষের অধিকারে, তাই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘ'টে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। রাজনীতিক দলগুলো বরং মাঝে মাঝে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে মিছিলের মানুষদের, তারা যখন মিছিলের পর মিছিলে হরতালের পর হরতালে স্বৈরাচারকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, তখন রাজনীতিক দলগুলো নানা ছুতোয় তাদের পেছনে টেনে ধরেছে। এরশাদ ক্ষমতায় থাকার জন্যে নানা ফাঁদ পেতেছে, সে-ফাঁদে রাজনীতিক দলগুলো ধরাও দিয়েছে। একটি ফাঁদ ছিলো সশস্ত্রবাহিনী দিবস, যেটি হঠাৎ ঘোষণা করা হয়, এবং রাজনীতিক দলগুলো তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। খুবই হতাশার দিন ছিলো সেটি, মনে হচ্ছিলো আন্দোলনকে উৎসর্গ ক'রে দেয়া হচ্ছে কোনো প্রতারণার পায়ে। রাজনীতিকেরা যখন গার্হস্থ্য সুখে সময় কাটিয়েছে তখন ঢাকা ও বাঙলাদেশ জুড়ে মিছিল চলেছে।'

www.BDeBooks.Com

নভেম্বরের শেষ সপ্তায় আন্দোলনের মহানাটকের চরম অঙ্কের সূচনা ঘটে আকস্মিকভাবে। স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, কাল মধ্যাহ্নের কাছাকাছি। দানবদের পাঠানো অসুর ঘাতকেরা আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু অকুতোভয় ছাত্ররা তাদের প্রতিহত করে। এরপর দ্রুতগতিতে ঘটনার পর ঘটতে থাকে ঘটনা, আন্দোলন তুঙ্গস্পর্শী হয়ে ওঠে সাতাশ তারিখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পাশে নিহত হয় মিলন, নব্বইয়ের আরেক আসাদ। এরপর আর গণবন্যাকে বালির বাঁধ দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। ছাত্ররা পথ দেখিয়েছে, আর সে-পথে প্রবাহিত হয়েছে প্রচণ্ড মানুষের ঢেউ। এরশাদ যখন আরেকটি ফাঁদ পাতে, নির্বাচনের পনেরো দিন আগে পদত্যাগের প্রতারণা ঘোষণা করে, তখন ভয় হচ্ছিলো এই বুঝি সুবিধাপরায়ণেরা হাত মেলাবে দানবদের সাথে। রাতেই ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে পড়েছিলো, তারা সান্ধ্যআইন, সেনাটহল কিছুই মানে নি; বেরিয়ে পড়েছিলো সাধারণ মহামানবেরা। এরপর ডিসেম্বরের চার তারিখ পর্যন্ত বাঙলাদেশ ছিলো মিছিলের মানুষের নিয়ন্ত্রণে; ক্ষমতা ছিলো একমাত্র তাদেরই হাতে, আর কারো মুঠোতে নয়। ওই মিছিল কোথা থেকে এসেছিলো? এখন যখন মানুষের মুখের দিকে তাকাই, তাদের মুখে খুঁজি মিছিলের স্বাক্ষর, চোখে খুঁজি মিছিলের মশালের আগুন, মুঠোতে খুঁজি বজ্রের দৃঢ়তা; কিছুই দেখতে পাই না, তাদের খুব সাধারণ মনে হয়। সাধারণ মানুষেরা আবার হয়ে উঠেছে সাধারণ। অথচ এই মানুষেরাই মিছিলে গিয়েছিলো, ডিসেম্বরের মধ্যরাতের ঢাকা শহরকে রূপান্তরিত করেছিলো বোশেখি মধ্যাহ্নে। ভূমিকম্প সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়, তারা এসেছিলো ভূমিকম্পের মতো। তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো এসে আঘাত করে স্বৈরাচারের দুর্গকে, ধ'সে পড়ে ন-বছরের প্রতিক্রিয়াশীল মানববিদ্বেষী দুর্নীতিপরায়ণ দুর্গ। কোনো নেতৃত্ব এ-গণঅভ্যুত্থান, যদিও তা অসম্পূর্ণ, সৃষ্টি করে নি; স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক প্লাবন, বন্যা, দাবানল, ভূমিকম্পের মতো তা এসেছিলো; কিন্তু তাকে পরিকল্পিতভাবে রোধ করা হয়েছে। ছদ্ম সাংবিধানিক বেড়া দিয়ে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে মিছিলের মানুষের প্লাবনশক্তিকে। প্লাবন আরো অনেক কিছুকে ভাসিয়ে নিতো, কিন্তু ভাসাতে দেয়া হয়নি। মিছিলের মানুষের শক্তিকে গোপনে অপহরণ ক'রে নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়া হয়েছে শক্তিমান সাধারণ মানুষকে। পাঁচ তারিখে কোথায় রাষ্ট্রপতি, কোথায় সংসদ, কোথায় সংবিধান? ওই সব তখন সম্পূর্ণ বাজেকথায় পরিণত হয়েছে। সব তখন দগ্ধ দাবানলে, সব তখন বিধ্বস্ত ভূমিকম্পে, সব তখন নিশ্চিহ্ন প্রবল প্লাবনে; কিন্তু তখন প্লাবনের অতল পাতাল থেকে জঞ্জালের মতো টেনে তোলা হয় একটি রাষ্ট্রপতিকে, দাবানলের ভস্মের ভেতর থেকে পোড়া কুকুরের মতো উদ্ধার করা হয় একটি রাষ্ট্রপতিকে, ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে লাশের মতো টেনে তোলা হয় একটি রাষ্ট্রপতিকে; এবং তার হাতে আবিষ্কার করা হয় ক্ষমতা, যা তার হাতে একবিন্দুও ছিলো না। ক্ষমতা তখন ছিলো শুধু মিছিলের মানুষের মুঠোতে। নব্বইয়ে তাই সাধারণ মহামানবের বাহ্যিক বিজয় ঘটলেও অন্তর্লোকে তাদের পরাভূতও করা হয়েছে। আবার মিছিলের মানুষের মুখ দেখতে অনেক বছর লাগবে, তাদের বিজয় দেখতে অনেক বছর লাগবে; কিন্তু তাদের দেখতে হবে। কেননা তারাই বাঙলার উদ্ধার।

জামাতের সাথে বসবাস :
গণতন্ত্রের বদলে ফ্যাশিবাদ

স্বাধীন বাঙলাদেশ যে-গরল কণ্ঠে ধ'রে আছে, যা তৃপ্তির সাথে গিলতে পারছে না কিন্তু পারছে না উগরে দিতেও, তার নাম জামাত। এ-গরলের উগ্র ক্রিয়া একাত্তরে বাঙালি ভোগ করেছে সমস্ত শরীরমনে; কিন্তু একাত্তরের স্মৃতি ফিকে হওয়ার আগেই আবার বাঙালি জেনেশুনে পান করে এ-বিষ। বিষ পানের যে-ফল হ'তে পারে, তাই ফলছে চারপাশে; এবং এখনি বিষ উগরে না দিলে জামাত বাঙালির ও তার মাতৃভূমির অস্তিত্বই বিপন্ন ক'রে তুলবে। একটি গণঅভ্যুত্থানের পর, একটি বড়ো শত্রুকে পরাভূত ক'রে, বাঙালি যখন গণতন্ত্রের পথে চলার উদ্যোগ নিচ্ছে, তখনি জামাত চট্টগ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছে একাত্তরের পাকিস্তানি সন্ত্রাস। জামাত প্রতিক্রিয়াশীল, এটি মুখে ধর্মের কথা বললেও এটির আসল ধর্ম হচ্ছে সন্ত্রাস ও ফ্যাশিবাদ, যার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে জামাত চট্টগ্রামে, এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে সারাদেশে ঘটানোর। শিশুও সাপ চেনে, বাঙালিরও চেনার কথা জামাতকে;' কিন্তু মনে হয় বাঙালি শিশুর থেকেও নির্বোধ, গোখরোর কামড় খেয়েও বাঙালি চেনে না সাপ কাকে বলে। বাঙলাদেশ ও তার বিভ্রান্ত রাজনীতি দুধকলা দিয়ে পুষে আসছে কালজাতটিকে, যার ছোবলে একদিন সম্পূর্ণ নীল হয়ে যেতে হবে বাঙালি জাতিকে। জামাত একটি মুখোশ প'রে নিয়েছে, সেটা ধর্মের মুখোশ; তবে জামাত ধর্মীয় দল নয়, যেমন ধর্মীয় দল নয় বিভিন্ন দেশের ধর্মতান্ত্রিক দলগুলো। জামাত ফ্যাশিবাদী, সন্ত্রাস জাগিয়ে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলা এর স্বভাব; এটি গণতন্ত্রের প্রবল প্রতিপক্ষ। এর প্রধান অবিশ্বাস গণতন্ত্রে, এর কোনো বিশ্বাস নেই মনুষ্যত্বে, বাঙালিত্বে। এর লক্ষ্য বাঙলাদেশকে একটি মধ্যযুগীয়, ফ্যাশিবাদপীড়িত, প্রতিক্রিয়াশীল ভূভাগে পরিণত করা, যেখানে বাস করবে না কোনো স্বাভাবিক মানুষ। জামাত মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ক'রেও বাঙলাদেশে রাজনীতি করছে, এ যেনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জর্মনিতে নাটশিদের, ইতালিতে ফ্যাশিবাদীদের রাজনীতি করা। পশ্চিম ইউরোপ মহাযুদ্ধের পর তার শরীর থেকে চুষে বের ক'রে দিয়েছে ওই বিষ, তার কোনো রকম উৎসারণের ওপর চোখ রাখছে প্রতিমুহূর্তে; কিন্তু বাঙলাদেশ জামাতের বিচার করতে পারে নি, বরং সমস্ত সুযোগ ক'রে দিয়েছে তার বিকাশের। রাষ্ট্রিক স্নেহেই জামাত দেড় দশক ধ'রে বিষাক্ত থেকে বিষাক্ততর হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের কুণ্ডলিতে পেঁচিয়ে ফেলেছে, বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের সমস্ত পথ রোধ করছে। জামাত যদিও গণবিরোধী, তবু জামাত সমস্ত সুফল

www.BDeBooks.Com

ভোগ করেছে গণআন্দোলনের; এবারের গণঅভ্যুত্থানে যদিও অংশ নেয় নি জামাত, কিন্তু অভ্যুত্থান-উত্তর বাঙলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন প্রচার পাচ্ছে, যাতে মনে হয় এটি এক গণমুখি রাজনীতিক দল। গণবিরোধী ফ্যাশিবাদী দলগুলো বিশেষ মুহূর্তে সুফল তোলে গণআন্দোলনের ও গণবিরোধিতার; গণআন্দোলনের সুবিধাজক মুহূর্তে এ-দলগুলো আন্দোলনের শ্লোগান তোলে, মিশে যায় আন্দোলনকারীদের সারিতে, আবার সুযোগ বুঝে এসব দল সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে বিভীষিকার মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। বিভীষিকার কাছে আত্মসমর্পণ করার স্বভাবও রয়েছে মানুষের। কুণ্ডলি পাকিয়ে যে-দানব ওঠে তাকে শুরুতেই বন্দি ক'রে ফেলা না হ'লে তাকেই প্রভু বলে মেনে নিতে হয়। জামাত জানে তার পক্ষে জনগণের সম্মতিতে বাঙলাদেশ অধিকার করা কখনো সম্ভব হবে না, তাকে পরিশেষে আশ্রয় নিতে হবে ফ্যাশিবাদী সন্ত্রাসেরই; তাই মাঝেমাঝে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি ক'রে সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্ররোচনা সৃষ্টি করা এর বিশেষ দরকার। চট্টগ্রামে জামাত-শিবির যে-নৃশংসতা দেখিয়েছে, এটা তার আসল নৃশংসতার কাছে জলের ফোটার চেয়েও ছোটো, আর নৃশংসতা যখন একদিন দৈত্যের মতো ছাড়া পাবে, তখন জামাত সারা বাঙলার চোখ উপড়ে ফেলবে, হাত কেটে ফেলবে, সারা বাঙলাদেশের বুকের ভেতর খঞ্জর ঢুকিয়ে দেবে। জামাতকে নিয়ে বাস করার বিষ পান করতে বাধ্য বাঙালি ও বাঙলাদেশ।

জামাত এমন ফ্যাশিবাদী সংঘ, যার শেকড় দেশের মাটিতে নেই; আছে কোনো মরুভূমিতে। জামাতের ধর্মব্যবসা অত্যন্ত আপত্তিকর, বাঙালি মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসকে বিভ্রান্ত ক'রে এ সংঘটি দানবের মতো জেগে উঠছে বাঙলাদেশের মাটি ও আকাশ ভেদ করে। এ-সংঘের আদর্শ ধর্ম নয়; এর আদর্শ সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, প্রগতিবিরোধিতা, গণতন্ত্রের সাথে শত্রুতা। এটিকে রাজনীতিক অধিকার দেয়া হয়েছে সম্ভবত কোনো বিদেশি শক্তির চাপে, এখনো সে-শক্তির জোরেই জামাত বাঙলাদেশে রাজনীতি ক'রে চলছে। কেউ কেউ গণতন্ত্রের নামে জামাতের রাজনীতি করার অধিকারের কথা বলে কিন্তু তাদের গণতন্ত্রবোধ বিভ্রান্ত বা তারাও জামাতের সাথে জড়িত। সামাজিক অধিকারের নামে কোনো সমাজই দস্যুতার অধিকার মেনে নিতে পারে না, ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের নামে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না গণতন্ত্রবিরোধী সংঘ। ইউরোপে এখনো আছে ফ্যাশিবাদীরা, সেখানে জন্ম হচ্ছে নব্যফ্যাশিবাদীদের, কিন্তু সেখানে তাদের রাজনীতি করার অধিকার নেই; মার্কিনদেশেও রাজনীতিক অধিকার নেই কু ক্লাক্স ক্ল্যান সংঘের। জামাত বাঙলাদেশের প্রকাশ্য কু ক্লাক্স ক্ল্যান। গণতন্ত্র ব্যক্তি ও সংস্থার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ওই প্রতিজ্ঞার জন্যেই গণতন্ত্র অস্বীকার করে সে-সব সংস্থা ও ব্যক্তির অধিকারকে, যারা ব্যক্তি ও সংস্থার অধিকারে বিশ্বাস করে না। বাঙলাদেশে গণতন্ত্র নেই বলেই জামাত আছে, আর যতোদিন জামাত আছে ততোদিন বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা নেই। জামাতের কথা উঠলেই ধর্মের কথা ওঠে, এটাই জামাতের বড়ো রাজনীতিক ও আবেগগত জয়; কারণ জামাত ধর্মের নামে চমৎকারভাবে বিভ্রান্ত করতে পেরেছে বাঙলাদেশকে। জামাতের কথা উঠলে ধর্মের কথা ওঠা একেবারেই অনুচিত, ওঠা উচিত জামাতের সন্ত্রাসবাদ ও

গণতন্ত্রবিরোধিতা, এমনকি ধর্মহীনতার কথা। বাঙলাদেশের কোনো দলই ধর্মবিরোধী নয়, সব দলেই রয়েছে ধর্মীয় আবেগ, সম্প্রতি কম্যুনিস্টরা ধর্মকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। বাঙলাদেশের যে কোনো সাধারণ মানুষ জামাতের যে-কোনো সদস্যের থেকে অনেক ধার্মিক, যদিও তাদের মতো সন্ত্রাসবাদী নয়। গণতন্ত্র ধর্মবিরোধী নয়, ধর্মান্ধও নয়; গণতন্ত্রের যে কোনো মানুষের ধর্মে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস পোষণের অধিকার রয়েছে। গণতন্ত্রে কোনো বিশ্বাস দিয়েই সন্ত্রাস জাগানোর কোনো সুযোগ নেই, ধর্ম দিয়েও নেই। জামাতের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা, ওই ক্ষমতা লাভে তাদের কৌশল সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাসকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে জামাত খাটায় ধর্মকে। তাই জামাতের পরিচয় সন্ত্রাসবাদী, স্বৈরাচারী, ফ্যাশিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল সংঘ রূপে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যার অস্তিত্ব থাকতে পারে না; আর তার অস্তিত্ব থাকলে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বাঙলাদেশ যদি গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখে আর জামাতের সাথেও বাস করে, তবে গণতন্ত্র হবে নামপরিচয়হীন গণকবর। বাঙলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন বেশ ব্যাপক; সমাজের সুবিধাভোগীরা প্রতিক্রিয়াশীলতায় মারাত্মকভাবে রুগ্ন; তাই জামাত হচ্ছে বলিষ্ঠ সাপের মতো। বাঙলাদেশকে এখন খুব মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখতে হবে জামাতের সাথে বসবাস করবে কিনা, বুকের ভেতরে সাপ পুষে নির্ভর জীবনের স্বপ্ন দেখবে কিনা? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাতের মাফিয়াসংঘ যে-সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তা একাত্তরকেও হার মানিয়েছে; তারা গোপনে সান্ধ্যআইনের নিস্তব্ধতার মধ্যে শিকারে বেরোয় নি, বেরিয়েছে প্রকাশ্যে; এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ক'রে তুলেছে বধ্যভূমি। তারা আক্রমণ করেছে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের, কোনো ধর্মীয় শ্লীলতাবোধ তাদের বিরত করে নি নারীপীড়ন থেকে; আর ছাত্র-শিক্ষকেরা তো অনেক দিন ধ'রেই তাদের খঞ্জরের লক্ষ্য। যদি এখনি দমন না করা হয় এ-দানবকে, তবে অচিরেই বাঙলাদেশ পরিণত হবে তার করুণ শিকারে। দেশ জুড়ে যদি বাঙালি সন্ত্রাস আর ফ্যাশিবাদ না চায়, দেখতে না চায় বিশশতকী কারবালা তবে এখনি নিষ্ক্রিয় করতে হবে জামাতকে। জামাতকে নিয়ে গণতন্ত্র ঘটতে পারে না, ঘটতে পারে শুধু গণতন্ত্রের মর্মান্তিক অপমৃত্যু।

www.BDeBooks.Com

বাঙলাদেশি গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ দান : গরিব গ্রহের সবচেয়ে রূপসী প্রধান মন্ত্রী

খালেদা জিয়াকে আমি দুবার দেখেছি, দুবারই একই জায়গায় : বাইরে-বিপ্লবী ভেতরে-স্বৈরতন্ত্রের-অনুচর একটি সাপ্তাহিকের ইংরেজি নববর্ষের পানোৎসবে। খালেদা জিয়াকে দেখার মধ্যে বিশেষ সুখ আছে। ওই উৎসবটি ছিলো সুপরিকল্পিত, তাতে জড়ো করা হতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ও দানবদের; তাতে একনায়কের সারমেয় আর গণতন্ত্রের বাঘেরা পরম বান্ধবের মতো গল্প করতে করতে পান করতো। সেখানে খালেদা জিয়াও আসতো। সে এলে হঠাৎ ময়লা হয়ে উঠতো ছোটো-বড়ো পর্দার নানা রঙ করা রূপসীরা, তাদের কারো মুখে ছুলি বা ব্রণের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠতো, কাউকে মনে হতো অত্যন্ত খর্ব : তাদের চারপাশের ভিড় ক'মে যেতো। তখন সারা প্রাঙ্গণে এক জায়গায়ই দেখা যেতো সৌন্দর্য। তবে ওই সৌন্দর্যকে ঘিরে থাকতো কয়েকটি কলঙ্ক, কয়েকটি সুবিধাবাদী প্রহরী পাহারা দিতো তাকে; ওই দৃশ্য দেখে আমার বিউটি ও বিস্টের কথা মনে পড়তো। খালেদাকে ঘিরে থাকতো যারা, তারা আগে থেকেই ছিলো দেশের কলঙ্ক, পরে আরো কলঙ্কিত হয়। তারা এমনভাবে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো, মনে হতো তারা দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়াতে পারছে না, তারা প'ড়ে আছে খালেদার স্যান্ডলের নিচের ঘাস ও মাটির অনেক নিচে।

একবার আমি খালেদাকে একটি গল্প শোনাতে চাই। তখন চারপাশে ভীষণ সাড়া প'ড়ে যায়, যেনো একটা মহাদুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, যা ঘটলে পৃথিবী খানখান হয়ে যাবে, মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না, বা বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের সমস্ত সম্ভাবনা চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে। সে মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারি আমাদের চারপাশ গণতন্ত্রের জন্যে কতো অনুপযুক্ত ও অপ্রস্তুত, প্রভু ও অনুচরের সম্পর্ক ছাড়া তারা আর কোনো সম্পর্কের কথা ভাবতেও পারে না। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার চারপাশের লোকেরা তাকেও উত্তীর্ণ করেছে একনায়কের স্তরে, যাকে শুধু তোশামোদ করা যায়, যার সাথে স্বাভাবিক গল্প করা যায় না। আমি খালেদাকে বলি, 'আপনার সাথে আমরা কিছু কথা বলবো; তবে আপনার এ-লোকজনেরা একটু দূরে গেলে ভালো হয়।' খালেদা জানতে চায়, 'কেনো' আমি তাকে জানাই তাকে একটি গল্প শোনাবো তার চারপাশের লোকগুলো সম্পর্কে, এবং ওই গল্পের একটি চরিত্রের নাম জিয়াউর রহমান। আমি সেদিন গল্পটি বলতে পারি নি, কেননা খুব উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি শুরু করে মওদুদ নামে খালেদার একটি প্রহরী, যাকে আমি দূরে গিয়ে দাঁড়াতে

বলেছিলাম। গল্পটি খালেদা সেদিন শুনলে তার পাশের মওদুদজাতীয়দের ভার তাকে বইতে হতো না।

গল্পটি সেদিন বলতে পারি নি, কিন্তু গল্পটির আবেদন আজো ফুরোয় নি। গল্পটি শুনেছি আমি ভেতর থেকে, গল্পটি বানানো নয় ব'লেই আমি বিশ্বাস করি। গল্পটি জিয়া ও একজন চিকিৎসক-রাজনীতিকের। জিয়া একদিন চিকিৎসককে ডেকে বললো, 'বড়ো ডাক্তার দেখে আপনাকে আনলাম, দলের দায়িত্ব দিলাম, কিন্তু কিছু করতে পারছেন না। কেনো? চিকিৎসক বললো, 'স্যার, পারবো কীভাবে? আপনি যে আমাকে কোথায় আনলেন!' জিয়া জানতে চাইলো, 'কেনো?' ডাক্তার বললো, 'যখন ডাক্তার ছিলাম, তখন আমার কাছে যারা আসতো তারা সবাই সত্য কথা বলতো; আর এখন আমার কাছে যারা আসে তারা সবাই মিথ্যা কথা বলে। কাজেই পারবো কী ক'রে?' গল্পটি সেদিন শুনলে গল্পটির ফল হাতেহাতে পেতো খালেদা। ওই উৎসবের কয়েক দিন পরেই খালেদার পা থেকে এরশাদের পায়ের নিচে চ'লে যায় মওদুদ; একজনের পা থেকে নিজেকে স্থানান্তরিত করে আরেকজনের পায়ে। যারা পদামৃতপায়ী তারা রসালো পা চাটতেই পছন্দ করে, যে-পায়ে রস নেই বা রসের সম্ভাবনা নেই, সে-পায়ের সেবায় তারা জিভ বেশিদিন ক্ষয় করে না। ওই বিপ্লবী পানোৎসবে পরের বছরও আবার দেখা যায় খালেদা ও মওদুদকে। তবে তখন অবস্থান বদলে গেছে তাদের; খালেদা একদিকে, তাকে ঘিরে কয়েকটি প্রহরী, তবে গত বছরের উত্তেজিত টেরিয়ারটি নেই। এবার সে অন্যদিকে, হাতে হুইস্কির পাত্র, এবং তাকে ঘিরে তার টেরিয়ারেরা।

খালেদা এখন প্রধানমন্ত্রী, এটা তার রাজনীতিক ও দ্বিতীয় পরিচয়; তার সহজাত ও প্রথম পরিচয় সে রূপসী। খালেদা নারীবাদী নয়, তাই সে নিশ্চয়ই নিজের রূপকে আপত্তিকর মনে করে না। সে হয়তো জীবনের প্রধান সুখগুলো পেয়েছে ওই কারণেই। তার কথা মনে হ'লে তার রূপের কথাই প্রথম মনে পড়ে জনগণের। তার রাজনীতিক জীবনের শুরুরও আগে যখনই তার কথা কেউ বলেছে, সে-ই পুতুলের সৌন্দর্যের কথা বলেছে; তার রাজনীতিক হয়ে ওঠার পরও ওই কথাটিই সবাই প্রথম বলে। নারীরা সাধারণত তাদের লিঙ্গের কারো রূপের প্রশংসা করে না, কিন্তু খালেদার রূপ নিয়ে তারাও উচ্ছ্বসিত। আমার একজন বন্ধু, যে এখন বড়োবেশি বড়ো পদে চ'লে গেছে, সে খালেদার রাজনীতিতে ঢোকার প্রথম দিন থেকেই এতো বিহ্বল হয়ে আছে যে খালেদা যদি বাঙলার প্রথম নারী-একনায়করূপেও দেখা দেয়, তবু সে খালেদাকে আন্তরিক সমর্থন দিয়ে যাবে। খালেদার জনসভায় জনসমাগম, তার দলের জয়, তার নিজের জয়ের পেছনে তার সৌন্দর্য কাজ করেছে অনেকখানি। শতকরা পাঁচটি ভোট যে গণতন্ত্রের নামে পড়ে নি, পড়েছে সৌন্দর্যের নামে, এতে আমি নিঃসন্দেহ। যারা সৌন্দর্যের নামে ভোট দিয়েছে, তারাই খাঁটি গণতান্ত্রিক; যারা বাঙলাদেশি জাতীয়তাবাদের নামে ভোট দিয়েছে, তারা গণতন্ত্রের জন্যে সমস্যা উঠতে পারে অদূর ভবিষ্যতেই। সৌন্দর্য রাজনীতির থেকে সব সময়ই উৎকৃষ্ট।

আমি প্রধানমন্ত্রীর সৌন্দর্যের কথা বলছি, এতে বাঙলাদেশের মতো গরিব গণতন্ত্রের দেশে অনেকেরই রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, সংসদে এ নিয়ে হৈচৈ বাধতে

www.BDeBooks.Com

পারে; কিন্তু গণতন্ত্রের মূল দেশগুলোতে রাজনীতিকদের রূপের আবেদন বড়োই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলাদেশের রাজনীতিকেরা স্থূল মানুষ, তারা সৌন্দর্য বোঝে না ব'লে গণতন্ত্রও বোঝে না; শুধু লাইসেন্স পারমিট মন্ত্রীগিরি বোঝে। রাজনীতিকেরা পশ্চিমে রূপবিজ্ঞানী[!]দের সঙ্গে বিস্তর সময় কাটায়, টিভিতে তারা কোন পোশাকে কোন প্রসাধনে দেখা দেবে, তা ঠিক করার ভার ছেড়ে দেয় রূপবিজ্ঞানীদের ওপর। তারা তৈরি করে দেয় রাজনীতিকের একটি আবেদনময় ভাবমূর্তি। আসলে সব ধরনের অভিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাজনীতি, রাজনীতিকেরা সবচেয়ে বড়ো, দেশজোড়া, পর্দার অভিনেতা-অভিনেত্রী। রাজনীতিতে রূপের আবেদনের দাম অনেক, খালেদা জিয়া এটা জানে না, এমন নয়; তার ভ্রুর ক্ষীণতা জানিয়ে দেয় রূপের মূল্য সে কতোটা বোঝে। বাঙলাদেশের পৃথিবীকে দেয়ার মতো কিছু নেই, তবে এবার দিয়েছে সৌন্দর্য। বাঙলাদেশ পৃথিবীকে গণতন্ত্র দিতে পারবে কিনা তা অনিশ্চিত; তবে বাঙলাদেশি গণতন্ত্র পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী প্রধান মন্ত্রী; এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার। পৃথিবীতে এখন সৌন্দর্যের বড়োই অভাব, গরিব বাঙলাদেশে তো সৌন্দর্যের খোঁজে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। এখন সে অভাব মিটবে, টেলিভিশনের প্রতিভাবান প্রযোজকেরা পাল্লা দিয়ে এখন ধনীদের ঘরেঘরে প্রতিদিন অনেকখানি সৌন্দর্য পৌঁছে দিয়ে সৌন্দর্যকে পচিয়ে ফেলবে।

কয়েক দশক আগে আরজেনটিনার একনায়ক পেরনের এক অনিন্দ্য রূপসী অভিনেত্রী স্ত্রী ছিলো। তার নামে পাগল ছিলো আরজেনটিনিরা; সে স্বামীকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলো, তার রূপে মুগ্ধ আরজেনটিনিরা ভোট দিয়েছিলো পেরনকে। ভোট পেয়ে পেরন হয়েছিলো একনায়ক, কিন্তু জনপ্রিয়। ওই রূপসী অল্পদিন পরেই মারা যায়, নইলে পেরনের পতনের পর সেও হতো রাষ্ট্রপ্রধান। একনায়কেরা রূপসীদের অনুরাগী হয়, পেরনও রূপানুরাগী ছিলো। রূপসীর মৃত্যুর পর আরেক রূপসীকে বিয়ে করে পেরন, তবে আরজেনটিনার রাজনীতির নিয়মে পেরন উৎখাত হয়; আরজেনটিনায় চলতে থাকে সামরিক একনায়কদের স্বৈরাচার। সামরিক একনায়কদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনে নির্বাসন থেকে দেবীর মতো কাজ করতে থাকে মৃত পেরনের দ্বিতীয় রূপসী; এবং কয়েক দশক পর নির্বাসন থেকে ফিরে সে হয় রাষ্ট্রপ্রধান। তার নাম কি ছিলো ইসাবেলা সে রূপসী ছিলো, তার রূপও মাতিয়েছিলো আরজেনটিনিদের; কিন্তু রূপে ভোলে নি আরজেনটিনার বন্দুকবর্গ। আরজেনটিনার ক্ষুধার্ত সেনাবাহিনী তাকেও উৎখাত করে। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর রূপের কথা বলা হয়েছে অনেক। মার্গারেট থেচারও ছিলো রূপসী, তার বুড়ো বয়সের প্রসাধন—কেশবিন্যাসও মাথা ঘোরানোর মতো। ওই রূপ তাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। কোরাজানেরও একটি সম্পদ তার রূপ। বেনজিরও তার শাণিত রূপে মুগ্ধ করতো ভোটার ও বুদ্ধিজীবীদের। খালেদা এদের সবার সেরা; টেলিভিশনে তাকে এখন এতো দেখেও যে বিরক্তি লাগছে না, তার কারণ তার ক্ষমতা নয়। ক্ষমতা তাকে শিগগিরই অপ্রিয় করবে, কিন্তু তার সৌন্দর্য তাকে অনেক দিন অনেকের কাছে প্রিয় করে রাখবে। [তবে বাঙলাদেশ টেলিভিশন এক কুৎসিত ব্যাপার, তা সব কিছু অল্পদিনেই জীবনানন্দীয় রীতিতে [ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-

ব্যবহৃত হয়ে শুয়ারের মাংস হয়ে যায় > পচিয়ে ঘিনঘিনে ক'রে তুলতে পারে, সৌন্দর্য সাবধান!]। কিন্তু বাঙলাদেশি গণতন্ত্র বাঙালিকে ও পৃথিবীকে আর কী দেবে? ওই গণতন্ত্র প্রথম দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী প্রধানমন্ত্রী; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে দেশ ও গ্রহকে একটি রূপসী প্রধানমন্ত্রী উপহার দেয়াই হয়তো হয়ে থাকবে বাঙলাদেশি গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ দান।

খালেদা জিয়া গরীব নিরক্ষর তৃতীয় বিশ্বের দুর্গত রাজনীতির একটি নতুন প্রবণতার রূপ। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি এক নোংরা ব্যাপার : এখানে তথাকথিত রাজনীতিকেরা লুটপাট আর কোন্দল করে, এবং সামরিক একনায়কেরা এসে দেশকে নরক ক'রে তোলে। তারা খুন করে ক্ষমতা দখল করে, পুরুষদের নিষ্ক্রিয় নিরণ্ড করে দেয়; পুরুষদের কাছে প্রত্যাশার আর কিছু থাকে না। তখন বিদ্রোহীরূপে দেখা দেয় নারীরা। তবে সব নারী নয়; যে-নারীরা একনায়কদের উত্থানে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদেরই বানানো হয়, ও তারাই হয়ে ওঠে, একনায়কদের প্রধান প্রতিপক্ষ। পঞ্চাশের শেষে সিংহলের বন্দনায়েকে খুন হয়, দেখা দেয় বেগম বন্দরনায়েকে; কিন্তু একবারের বেশি ক্ষমতায় সে আসতে পারে নি। একুইনোর হত্যাকাণ্ডের ফলে উত্থান ঘটে কোরাজানের। পাকিস্তানে পিতার লাশ এক দশক ধ'রে বর্তমান কালের সবচেয়ে হিংস্র একনায়ককে উপেক্ষা ক'রে বয়ে বেড়ায় বেনজির। জনগণ তাকে বরণ করে, কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাকে বরণ করে নি; ওই বাহিনী তাকে যে কোথায় নিয়ে যাবে, তা সে জানে না। বধ্যভূমিতে? ব্রহ্মদেশে পিতার উত্তরাধিকারীরূপে গত বছর দেখা দেয় সুকি, কিন্তু সেনাপতিরা আজো তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি; হয়তো বেরোতে দেবে যেদিন তার শ্মশানে যাওয়ার দরকার হবে। বাঙলাদেশে দুজন, হাসিনা ও খালেদা, অনেক দিন ধ'রে বয়ে বেড়াচ্ছে পিতা ও স্বামীর লাশ; এবার খালেদা পেয়েছে লাশ বয়ে বেড়ানোর পুরস্কার। ইন্দিরার কথাও মনে পড়তে পারে এখানে, সে লাশ বয় নি; কিন্তু ক্ষমতায় তাকে বসিয়েছিলো পিতাই। বন্দরনায়েকে, ইন্দিরা, কোরাজান, বেনজির, (সুকি), খালেদা, (হাসিনা), নারী, তবে এরা কেউ নারীদের প্রতিনিধি নয়। তারা সবাই পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি; তারা উঠে এসেছে শক্তিমান পুরুষের কবর থেকে।

তাদের রাজনীতিতে আসার কোনো কথা ছিলো না। বন্দরনায়েকে রান্নাবান্না করতো, কোরাজান বিয়ের পর চাকুরি ছেড়ে ঘরসংসার করছিলো, পিতা বেঁচে থাকলে বেনজির হয়তো পশ্চিমেই থেকে যেতো। সুকি বিদেশে বিদেশী স্বামীর সংসার দেখছিলো; হাসিনা বিদেশে স্বামীর জন্যে প্রাতঃরাশ তৈরি করছিলো, আর খালেদা হয়তো ভ্রু সরু ক'রে ক'রে সময় কাটাচ্ছিলো। খালেদা ছিলো এক কড়া সানগ্লাসপরা একনায়কের স্ত্রী, যে বউকে বাইরেও আনতো না। খালেদা এখন বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এ-সংবাদে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হতো, এমনকি আপত্তি জানাতো, তার নাম লেফটেনেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান। তৃতীয় বিশ্বে একনায়কেরা গৃহবধূদের ক'রে তুলছে প্রতিবাদী দেশনেত্রী; যারা হয়তো সংসারও ঠিকমতো গোছাতে পারতো না, তারা হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান। এটা হয়ে উঠেছে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিক নিয়তি।

www.BDeBooks.Com

একনায়কেরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহ্য করে না; তাদের ভেড়া বানায় বা খুন করে। তখন নারীদের নেত্রীত্ব গ্রহণ না ক'রে উপায় থাকে না। এ-প্রপঞ্চটি একান্তভাবে তৃতীয় বিশ্বের, যেখানে নারীর কোনো মূল্য নেই সেখানেই নারী হয়ে ওঠে রাষ্ট্রপ্রধান। অনেকের কাছে এটা বিস্ময়কর, তবে এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়; সামরিক একনায়কপীড়িত তৃতীয় বিশ্বের এটা রাজনীতিক নিয়তি।

খালেদা সম্ভবত স্বপ্ন দেখার বেশি সুযোগ পায় নি; কিন্তু তার জীবনে স্বপ্নের থেকেও অভাবিত ব্যাপার বাস্তবায়িত হয়েছে। কিশোরী বয়সে হয়তো সে গৎবাঁধা রাজপুত্রঘটিত স্বপ্ন দেখেছে, তারপর হয়তো স্বপ্ন দেখেছে স্বামী কর্নেল হয়ে অবসর নিচ্ছে পাকিস্তানি বাহিনী থেকে। তখন পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো বাঙালি মেজরের স্ত্রীর এর থেকে বড়ো স্বপ্ন দেখার কথা নয়। তবে একদিন সে নিজেকে দেখতে পায় বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতির স্ত্রীরূপে। বিস্ময়টি নিজের জন্যে নয়, স্বামীর জন্যে। এদেশে কারো মঞ্চে হঠাৎ অন্ধকার নামে, কারো মঞ্চে হঠাৎ দীপাবলি জ্ব'লে ওঠে। অন্ধকার নেমেছিলো বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডিতে; ঝাড়লণ্ঠন জ্ব'লে ওঠে জিয়ার বাড়িতে। বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্টি করে একজন জিয়া বা জিয়াউর রহমান নামের কিংবদন্তি, নিতান্তই আকস্মিক ওই সৃষ্টি; কিন্তু তা বাঙলাদেশের চিত্তকে নাড়া দেয়। জিয়া কতোটা যুদ্ধ করেছে, জানি না; যুদ্ধের সময় বাঙলাদেশের ভেতরেও ঢুকেছে কিনা, তাও জানি না; তবে ওসবের কোনো মূল্য নেই। তার সমস্ত মূল্য সাতাশে মার্চের ঘোষণায়—'আমি মেজর জিয়া বলছি।' ওই ঘোষণাটুকুই জিয়া; ওই ঘোষণাটুকু বাদ দিলে জিয়া আরেকজন খালেদ মোশাররফ। জিয়া যদি দিনরাত যুদ্ধ করতো, কিন্তু ওই ঘোষণাটুকু না করতো, তাহলে সে জিয়া হতো না। নিতান্তই আকস্মিকভাবে জন্ম হয় মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র কিংবদন্তির—জিয়া বা জিয়াউর রহমানের। আমি তাকে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী মনে করি না, আবার এও মনে করি না যে তার আগে আর কেউ টেলিফোনে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো; আমি মনে করি মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো জিয়া। ওই ঘোষণা অন্য যে-কেউ করতে পারতো, কিন্তু অন্য কেউ করে নি, জিয়া করেছে; ঐতিহাসিক আকস্মিকতার সুযোগটি পেয়েছে সে। ওই ঘোষণাটুকুই তাকে পরিণত করে একনম্বর মুক্তিযোদ্ধায়, কিংবদন্তিতে।

বাঙলাদেশের দুর্ভাগ্য একনম্বর মুক্তিযোদ্ধাও চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা থাকে নি। আকস্মিকতা তাকে ক্ষমতার শীর্ষে নিয়ে যায়, এবং সে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনেকাংশে সংশোধন ক'রে ফেলে। জিয়া ছিলো সামরিক ব্যক্তি, আর সামরিক কেউ কখনো গণতান্ত্রিক হতে পারে না। জিয়া ছিলো বুট থেকে সানগ্লাস পর্যন্ত একনায়ক; তবে বড়ো মাপের ছিলো না। বাঙলাদেশের সবচেয়ে বড়ো মাপের একনায়ক মুজিব। জিয়া জীবনের শেষ দিকে হয়তো ভুলেও গিয়েছিলো যে সে একদা মুক্তিযোদ্ধা ছিলো; সে হয়ে উঠেছিলো রাজাকারদের আশ্রয়স্থল, সে মুক্তিযোদ্ধাদের দীক্ষিত করেছিলো রাজাকারদের মন্ত্রে। তার দল ভ'রে গিয়েছিলো নষ্টভ্রষ্ট দুশ্চরিত্র রাজনীতিকে, অবসরপ্রাপ্ততে, আর রাজাকারে। তার সময় ঘনঘন অভ্যুত্থান হয়েছে, রাস্তায় মিছিল করাও ছিলো কঠিন। জিয়াই বাঙলাদেশের মুখটিকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে

দিয়েছিলো, বেঁচে থাকলে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার পুণ্যটি তাকেই অর্জন করতে হতো। এরশাদের সূচনা সে তার দল আর এরশাদের দলের মধ্যে চরিত্রে কোনোই পার্থক্য নেই; সে বেঁচে থাকলে হয়তো একদিন তারও বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটতো। তবে মুক্তিযোদ্ধার মহিমা ও আততায়ীদের হাতে মৃত্যু তাকে চরম পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তার ভাগ্য সব সময়ই ভালো; মুজিবের হত্যাকাণ্ড আরো নৃশংস. মুজিব তার থেকে অনেক বড়ো মাপের, তবু মুজিব আজো অপুনর্বাসিত।

খালেদা, জিয়ার মৃত্যুতে, নিশ্চয়ই গভীর শোকাভিভূত হয়েছিলো; কিন্তু কারো মনে শোক চিরকাল থাকে না। কোনো শোকই নিজের অস্তিত্বের ও প্রতিষ্ঠার থেকে বড়ো নয়। খালেদা এখন আর শোকাতুর নয়, সে শক্তিমান প্রধান মন্ত্রী; তাই একটি গভীর নির্মম মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন জাগছে মনে-যখন সে প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ নেয়, তখন কি স্বামীর মৃত্যু তাকে মুহূর্তের জন্যে হ'লেও সুখী ক'রে তুলেছিলো? কেননা ওই মৃত্যুটি ছাড়া তার জীবনে এ-মুহূর্তটি কখনো আসতো না। জীবিত জিয়ার মানে হচ্ছে খালেদা গৃহবধূ, রাষ্ট্রপতির স্ত্রী; আর নিহত জিয়ার অর্থ হচ্ছে খালেদা প্রধান মন্ত্রী। ক্ষমতা সে ভোগ করবে এটা বোঝা যায়;—তার দলের লোকেরা তার সাথে যেভাবে আচরণ করে, তাতে তাকে একজন একনায়কই মনে হয়। তার মুখোমুখি জাতীয়তাবাদীদের খুবই অসহায় দেখায়, মনে হয় ভয়ে কাঁপছে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ছেলে বুড়ো। তারা কি ওই মুখের সৌন্দর্যে অস্বস্তি বোধ করে, নাকি ওই মুখে দেখতে পায় জিয়ার কর্কশ সানগ্লাস? সে যে-দলটির প্রধান, সেটি থাকে না সে না থাকলে। তার দলনেত্রীত্ব কোনো রাজনীতিক যোগ্যতার ফল নয়, তার নেত্রীত্ব সহজাত; তাকে ঘিরে আছে অসহায় দলীয় রাজনীতিকেরা।

খালেদা কী দিতে পারবে বাঙলাদেশকে? বাঙলাদেশকে সত্যিই কিছু দিতে হ'লে যে-রাজনীতিতে বিশ্বাস দরকার, তাতে বিশ্বাস করে না সে, ও তার দল। তার দল ধনীদের ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতিদের। তার দল গণতন্ত্রেও পুরোপুরি দীক্ষিত নয়, তার দলের ক্রিয়াকলাপ প্রগতির বিরুদ্ধে কাজ করছে অনেক বছর ধ'রে। তাই তার দল বুর্জোয়াদের বিশেষ কিছু দিতে পারবে না। তার দল হয়তো কিছুটা স্বৈরতন্ত্র দেবে, আরো কিছুটা ধর্ম দেবে। আর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ও প্রভৃতি ও প্রভৃতি? এসব কারো পক্ষেই ঠিকমতো দেয়া সম্ভব হতো না, খালেদার পক্ষেও সম্ভব হবে না। কিন্তু সে কি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে তার ধনপতি সংসদ সদস্যমণ্ডলিকে? সে কি গরিব দেশকে জানাবে কতো ব্যয় হচ্ছে গণতন্ত্রের রাজপুত্রদের জন্যে? সে কি নিজে জবাবদিহি করবে জনগণের কাছে? সংসদ কি জবাবদিহি করবে জনগণের কাছে? জনগণকে মুগ্ধ থাকতে হবে টেলিভিশনে তার সৌন্দর্য, আর তার মন্ত্রী-আমলাদের কুৎসিত নাদুশনুদুশ অসৌন্দর্য দেখেই? বাঙলাদেশি গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ দান কি হয়ে থাকবে পৃথিবীর সবচেয়ে রূপসী প্রধান মন্ত্রী? কিন্তু সৌন্দর্য বড়োই অল্পায়ু, পাঁচই এপ্রিলে যা সুন্দর, পাঁচই মে-তে তা হয়ে উঠতে পারে কুশ্রী। রাজনীতির কাজ সৌন্দর্য হরণ করা, খালেদা যেনো না হয়ে ওঠে তার করুণ শিকার।

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com